মূল মুদ্রণের পূর্বের কপি

প্রশিক্ষণ মডিউল

কমিউনিটি প্যারামেডিক-২০১৮

সপ্তমপত্র

সংক্রামক ও নব-আবির্ভুত রোগসমূহ এবং অসংক্রামক রোগসমূহ

বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল

প্রিন্ট: ২৪-০১-২০১৯

কমিউনিটি প্যারামেডিকদের

মৌলিক প্রশিক্ষণ

বিষয় : ৭

সংক্রামক ও নব-আবির্ভুত রোগসমূহ এবং অসংক্রামক রোগসমূহ

বিষয় ৭ ঃ সংক্রামক ওনব-আবির্ভুত রোগসমূহ এবং অসংক্রামক রোগসমূহ

অধ্যায় ১ ঃ সংক্রামক ও নব-আবির্ভুত রোগসমূহ

পাঠ -১	যক্ষ্মা	০৪
পাঠ-২	কৃমি	১৩
পাঠ-৩	ডেঙ্গু জ্বর	১৬
পাঠ-৪	জিকা ভাইরাস	১৯
পাঠ-৫	ম্যালেরিয়া	২২
পাঠ-৬	বার্ড ফ্লু	২৬
পাঠ-৭	সোয়াইন ফ্লু	২৯
পাঠ-৮	চিকুনগুনিয়া	৩২

অধ্যায় ২ ঃ অসংক্রামক রোগসমূহ

পাঠ-১	উচ্চ রক্তচাপ	৩২
পাঠ-২	ডায়াবেটিস	৩৬
পাঠ-৩	হাঁপানী বা এ্যাজমা	৪০
পাঠ-৪	পেপটিক আলসার	৪৩
পাঠ-৫	আয়রন-এর অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা	৪৫
পাঠ-৬	আর্সেনিকোসিস	৫০
পাঠ-৭	স্তন ক্যান্সার	৫৩
পাঠ-৮	জরায়ু মুখে ক্যান্সার	৫৫

অধ্যায় ১ ঃ সংক্রামক ও নব-আবির্ভুত রোগসমূহ

পাঠ -১
যক্ষ্মা (Tuberculosis)

যক্ষ্মা কি?

যক্ষ্মা একটি জীবাণু ঘটিত রোগ যা মাইকোব্যাকটেরিয়াম টিউবারকুলোসিস (Mycobacterium tuberculosis) নামক জীবাণু দিয়ে হয়।

সংক্রমণের স্থান অনুযায়ী যক্ষ্মা দু' প্রকার-

১. ফুসফুসের যক্ষ্মা (Pulmonary TB)
২. ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষ্মা(Extra-Pulmonary TB)

তবে ফুসফুসের যক্ষ্মায়আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা সর্বাধিক, যা সমগ্র যক্ষ্মা রোগীর ৮০% এর উর্ধ্বে।

ফুসফুসের যক্ষ্মা দু' প্রকার-

ফুসফুসের যক্ষ্মা - কফ পরীক্ষায় জীবাণু পাওয়া গেছে (Pulmonary smear positive TB):

যাদের কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়, এ ধরনের ফুসফুসজনিত যক্ষ্মার মাধ্যমে রোগের সংক্রমণ ঘটে ও বিস্তার লাভ করে। সুতরাং যক্ষ্মা রোগের বিস্তার রোধ করতে এবং রোগীকে বাচাঁতে বিলম্ব না করে এ রোগের চিকিৎসা শুরু করা জরুরী।

ফুসফুসের যক্ষ্মা - কফ পরীক্ষায় জীবাণু পাওয়া যায়নি (Pulmonary smear negative TB):

যাদের কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায় না অথচ ফুসফুসে যক্ষ্মা আছে। সুস্থ ব্যক্তির দেহে এ রোগ ছড়ায় না।

যক্ষ্মা কিভাবে ছড়ায়?

যক্ষ্মা সাধারণতঃ বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। যক্ষ্মা রোগীর কফ, হাঁচি-কাঁশির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু বের হয়ে বাতাসে মিশে ও শ্বাস গ্রহণের সময় তা সুস্থ ব্যক্তির ফুসফুসে ঢুকে বংশ বৃদ্ধি করে এবং রোগ তৈরী করে। একজন যক্ষ্মা রোগী (যিনি চিকিৎসা গ্রহণ করেননি) বছরে প্রায় ১০-১৫ জন ব্যক্তিকে সংক্রমিত করতে পারে। এভাবে সে তার পরিবারের সদস্য ও আশে-পাশের ব্যক্তির মাঝেও রোগ ছড়াতে পারে।

যক্ষ্মার ভয়াবহতাঃ

সারা বিশ্বে এক তৃতীয়াংশ মানুষ যক্ষ্মা জীবাণু দ্বারা সংক্রমিত। যক্ষ্মা একমাত্র জীবাণু যা সর্বাধিক মৃত্যুর কারণ এবং উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিরোধ নিরাময় যোগ্য ২৫% মৃত্যুই ঘটে যক্ষ্মার কারণে । ইদানিং HIV/AIDS এর কারণে যক্ষ্মা সারা বিশ্বে ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। যারা HIVভাইরাস সংক্রমিত, তারা সহজেই যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়। স্বল্পোন্নত বিশ্বে বেশীর ভাগ AIDSরোগীই যক্ষ্মার কারণে মৃত্যু বরণ করে।

যক্ষ্মার উপসর্গ ও লক্ষণ সমূহ ঃ

১. তিন সপ্তাহের অধিক সময় পর্যন্ত কাশি যক্ষ্মা রোগের প্রধান লক্ষণ, এছাড়াও

২. প্রতিদিন সন্ধ্যায় বা রাতে জ্বর আসা
৩. বুকে ব্যথা
৪. ক্ষুধা কমে যাওয়া
৫. ওজন কমে যাওয়া
৬. অল্প শ্রমেই ক্লান্ত বোধ করা
৭. মাঝে মাঝে কাশি বা কফের সাথে রক্ত আসা

যক্ষ্মা নির্ণয়ঃ

কোন ব্যক্তির তিন সপ্তাহের অধিক সময় কাশি থাকলেই তাকে যক্ষ্মা রোগী বলে সন্দেহ করা যায়। কফ পরীক্ষার মাধ্যমে তার রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

কফ পরীক্ষার গুরুত্ব ঃ

যক্ষ্মা রোগ নির্ণয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্যে (যেমন-কফ পরীক্ষা, এক্স-রে প্রভৃতি) কফ পরীক্ষাই সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য। শুধুমাত্র কফ পরীক্ষার মাধ্যমেই সংক্রামক যক্ষ্মা রোগী চিহ্নিত করা যায়। উপজেলা হাসপাতাল, বক্ষব্যধি ক্লিনিক/হাসপাতাল এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক এনজিও ক্লিনিকে বিনামূল্যে কফ পরীক্ষা করা হয়।

কফ সংগ্রহের কৌশলঃ

কোন ব্যক্তিকে যক্ষ্মা রোগী বলে সন্দেহ হলে ক্লিনিকের স্বাস্থ্য কর্মী রোগীকে কফ সংগ্রহের জন্য একটি বিশেষ পাত্র সরবরাহ করবেন এবং ঘরের ভিতরে দরজা/জানালা খোলা অবস্থায় অথবা খোলা জায়গায় বুকের ভিতরের কফ পাত্রে সংগ্রহ করতে বলবেন। রোগীকে আরও একটি পাত্র সরবরাহ করতে হবে এবং পরের দিনের সকালের কাশি একই নিয়মে সংগ্রহ করার পরামর্শ দিতে হবে। পরের দিন স্বাস্থ্য কেন্দ্রে রোগীর উপস্থিতিতে আরও একটি কফ নিতে হবে। এভাবে সংগৃহীত ৩টি কফের নমুনা সংগ্রহ ও পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে যক্ষ্মার জীবাণু রয়েছে কিনা।

একমাত্র কফ পরীক্ষা করে তিনটির অন্ততঃ দুটি নমুনায় জীবাণু পাওয়া গেলে ১০০ ভাগ নিশ্চিতভাবে যক্ষ্মা রোগ নির্ণয় করা যায়।

যক্ষার চিকিৎসাঃ

প্রতিটি উপজেলা হাসপাতাল, বক্ষব্যধি ক্লিনিক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক এনজিও ক্লিনিকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে যক্ষ্মার পরীক্ষা ও চিকিৎসা পাওয়া যায়। নিয়মিত, পরিমিত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষধ সেবনের মাধ্যমে যক্ষ্মা সম্পূর্ণভাবে ভাল হয়। অনিয়মিত, অপর্যাপ্ত এবং অসম্পূর্ণ চিকিৎসায় যক্ষ্মা জটিল আকার ধারণ করে এবং পরবর্তীতে নিয়মিত ও পর্যাপ্ত চিকিৎসা করলেও আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে। নিয়মিত, সঠিক মাত্রায়, ক্রমাগত ও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ঔষধ সেবনের ফলে যক্ষ্মা সম্পূর্ণ নিরাময়ের মাধ্যমে এই রোগের

সংক্রমণের হার কমিয়ে আনা সম্ভব। সফলভাবে যক্ষ্মারপূর্ণ চিকিৎসা সম্পন্ন করার প্রক্রিয়া এই রোগ প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

যক্ষ্মার চিকিৎসায় ব্যবহৃত ঔষধ সমূহঃ

- রিফামপিসিন
- আইসোনিয়াজিড
- পাইরাজিনামাইড
- ইথামবিউটাল
- স্ট্রেপটোমাইসিন

যক্ষ্মার ঔষধ সমূহ দুই ভাবে পাওয়া যায়

১. নির্দিষ্ট মাত্রা ও বিভিন্ন ঔষধের সমন্বয়ের ট্যাবলেট (Fixed Dose Combination or FDC)

২. আলাদা ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল(Individual Tablets or Capsule)

আলাদা ট্যাবলেট বা ক্যাপসুলের চেয়ে FDC নির্দিষ্ট মাত্রা ও বিভিন্ন ঔষধের সমন্বয়ের ট্যাবলেট নীচের সুবিধাগুলি বিদ্যামান-

(ক) রোগীর দৈহিক ওজন অনুযায়ী ঔষধের মাত্রা নির্দিষ্ট করা আছে এবং আলাদা ট্যাবলেট/ক্যাপসুলের বদলে একই ট্যাবলেট কয়েকটি ঔষধের Combination থাকায় চিকিৎসা পত্রে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক কম।

(খ) ট্যাবলেটের সংখ্যা কম হওয়ায় রোগী চিকিৎসা সম্পূর্ণ করতে উৎসাহ রোধ করেন।

(গ) সরাসরি তত্ত্বাবধানে বা DOTএর মাধ্যমে চিকিৎসা চালাতে সুবিধা হয়।

FDC এর কিছু অসুবিধাও আছে যেমন ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে কোন ঔষধের কারণে এই প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে তা জানা সম্ভব নয়। এ ক্ষেত্রে আলাদাভাবে উপস্থাপিত ট্যাবলেট বা ক্যাপসুল সেবন করতে হবে।

অতীত চিকিৎসায় ইতিহাসের উপর ভিত্তি করে যক্ষ্মা রোগীকে নিম্নলিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায়-

- New case (নতুন রোগী)ঃ যে সমস্ত রোগী অতীতে কোন যক্ষ্মার চিকিৎসা গ্রহন করেননি অথবা যে সমস্ত রোগী এক মাসের কম সময় ধরে যক্ষ্মার চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন।
- Relapse (রিলাপস)ঃ যে সমস্ত যক্ষ্মা রোগীকে (ফুসফুসের যক্ষ্মা) পূর্বে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করা হয়েছে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ বলে ঘোষণা করা হয়েছিলকিন্তু বর্তমানে কাশির সমস্যা নিয়ে ডাক্তারের স্মরণাপন্ন হয়েছেন এবং কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে।

- Failure (ফেইলুর)ঃ যে সমস্ত যক্ষ্মা রোগীর চিকিৎসার পঞ্চম মাসে কফে যক্ষ্মা রোগের জীবাণু পাওয়া যায় অথবা যে রোগীর চিকিৎসার শুরুতে কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়নি কিন্তু চিকিৎসা চলাকালীন ২ মাস পরে কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে।
- Defaulter (ডিফল্টার)ঃ যে সমস্ত রোগী চিকিৎসা চলাকালীন সময় ২ মাস বা তার ও বেশী সময়ের জন্য যক্ষ্মার চিকিৎসা গ্রহণ করেননি।
- Transferred in এবং Transferred outঃ যে সমস্ত যক্ষ্মা রোগী চিকিৎসা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং পূর্বের স্বাস্থ্য সেবার ব্যবস্থাপনা পরিবর্তন করে নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনায় নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। এই ক্ষেত্রে রোগী নতুন স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার জন্য Transferred in এবং পূর্বের ব্যবস্থাপনা হতে Transferred outহিসেবে বিবেচিত হবেন।
- Chronic ঃ যে সমস্ত যক্ষ্মা রোগী প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে (DOT) পুনরায় চিকিৎসা (Retreatment) সম্পূর্ণ করার পরও কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া যায়।

যক্ষা চিকিৎসার ধাপ সমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়ঃ

ক) ইনটেনসিভ ফেজঃ যক্ষ্মার নতুন রোগী (New case) এবং পুনরায় চিকিৎসার (Retreatment) ক্ষেত্রে এ ধাপের মোট সময়কাল যথাক্রমে দুই ও তিন মাস এবং এ ক্ষেত্রে রোগী প্রতিদিন ঔষধ গ্রহণ করবেন।যক্ষা চিকিৎসায় এই ধাপের মূল উদ্দেশ্য রোগের জীবাণুর বিভাজন বা বংশ বৃদ্ধি কমিয়ে আনা এবং সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা। যেহেতু এই ধাপটি যক্ষা চিকিৎসায় সাফল্য লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সেহেতু রোগী যাতে DOTপদ্ধতির আওতায় নিয়মিতভাবে পূর্ণ´মেয়াদে ঔষধ গ্রহণ করেন DOTপ্রদানকারীর (গ্রাম ডাক্তার/স্বাস্থ্য কর্মীর/সিপি) সেদিকে লক্ষ্য রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(খ) কন্টিনিউয়েশন ফেজঃ নিয়মিত এই ফেজ বা ধাপে চিকিৎসার ফলে রোগীর দেহের বাকী রোগ জীবাণুগুলো ধ্বংস হতে পারে। সুতরাং এই ধাপে নিয়মিত চিকিৎসা নিশ্চিত না করলে রোগীর দেহে যক্ষ্মারর রোগ জীবাণু থেকে যেতে পারে এবং ঔষধের অকার্যকারিতা (Muti-drug registance) সহ নানা রকম জটিলতা দেখা দিতে পারে।

ক্যাটাগরি (Category) অনুযায়ী যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসাঃ

ক্যাটাগরি-১

যে ধরনের রোগী এতে চিকিৎসা পাবেন-

- কফে জীবাণুযুক্ত নতুন রোগী (যিনি কখনই যক্ষ্মার চিকিৎসা নেননি অথবা এক মাসের কম সময় চিকিৎসা নিয়েছেন)
- মারাত্মক অসুস্থ স্পুটাম নেগেটিভ যক্ষ্মা ও মারাত্মক ফুসফুস বর্হিভূত যক্ষ্মা রোগী।

চিকিৎসার মেয়াদকাল ও ঔষধ ঃ

৬ মাস মেয়াদী এই ক্যাটাগরীতে প্রথম ২ মাস ইনটেনসিভ (রোগী প্রতিদিন ঔষধ সেবন করবেন) ও পরবর্তী ৪ মাস কন্টিনিউয়েশন ফেজ (রোগী প্রতিদিনঔষধ সেবন করবেন)। উভয় ফেজ এ রোগী ডাক্তার বা স্বাস্থ্যকর্মীর সরাসরি তত্ত্বাবধানে ঔষধ সেবন করবেন।

2(RHEZ)+ 4 (RH)

R =রিফামপিসিন, H=আইসোনিয়াজিড,E =ইথামবুটল,Z = পাইরাজিনামাইড

ক্যাটাগরি-২

যে ধরনের রোগীরা এতে চিকিৎসা পাবেন-

- ক্যাটাগরি-১ এ ফেইলিওর রোগী অর্থাৎ যে সমস্ত রোগীর চিকিৎসা শুরুর পঞ্চম মাসে কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে (smear positive)
- যে সমস্ত রোগীকে চিকিৎসক কর্তৃক যক্ষ্মা চিকিৎসায় সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভকারী হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছিল কিন্তু পরবর্তীতে কফে যক্ষ্মার জীবাণু পাওয়া গিয়েছে ।

চিকিৎসার মেয়াদকাল ও ঔষধঃ

এ চিকিৎসা পদ্ধতি ৮ মাস মেয়াদী, যার প্রথম ৩ মাস ইনটেনসিভ ফেজ ও পরবর্তী ৫ মাস কন্টিনিউয়েশন ফেজ।

- উভয় ফেজ-এ 2(RHEZ)S+1(RHEZ)+5(REH)
- রোগী ইনটেনসিভ ফেজএবং কন্টিনিউয়েশন ফেজ-এ প্রতিদিন ঔষধ সেবন করবেন।

FDC ট্যাবলেটের মাত্রা সমূহঃ

- 4FDC = রিফামপিসিন ১৫০ মিঃ গ্রাঃ + আইসোনিয়াজিড ৭৫ মিঃ গ্রাঃ +পাইরাজিনামাইড ৪০০মিঃ গ্রাঃ +ইথামবিউটল ২৭৫ মিঃ গ্রাঃ
- 3FDC= রিফামপিসিন ১৫০মিঃ গ্রাঃ + আইসোনিয়াজিড ৭৫ মিঃ গ্রাঃ + পাইরাজিনামাইড ৪০০মিঃ
- 2FDC= রিফামপিসিন ১৫০মিঃ গ্রাঃ + আইসোনিয়াজিড ১৫০ মিঃ গ্রাঃ

প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য FDC ট্যাবলেটের মাত্রা সমূহঃ

ক্যাটাগরি -১

চিকিৎসা শুরুর ঠিক পূর্বে ওজন (**kg**)	**ইনটেনসিভ ফেজ (২ মাস)**	**কন্টিনিউয়েশন ফেজ (৪ মাস)**
	4FDC ট্যাবলেটের সংখ্যা (প্রতিদিন ঔষধ সেবন)	**2FDC ট্যাবলেটের সংখ্যা (প্রতিদিন ঔষধ সেবন)**

৩০-৩৭	২	২
৩৮-৫৪	৩	৩
৫৫-৭০	৪	৪
>৭০	৫	৫

ক্যাটাগরি -২

চিকিৎসা শুরুর ঠিক পূর্বে ওজন (kg)	ইনটেনসিভ ফেজ (৩ মাস) প্রতিদিন ঔষধ সেবন/গ্রহণ		কন্টিনিউয়েশন ফেজ (৫ মাস) প্রতিদিন ঔষধ সেবন	
	4FDCট্যাবলেটের সংখ্যা	**Inj. Streptomycin** (প্রথম দুই মাস)	**2FDC** ট্যাবলেটের সংখ্যা	ইথামবিউটল ৪০০ মিঃ গ্রাঃ(ট্যাবলেটের সংখ্যা)
৩০-৩৭	২	৫০০ মিঃ গ্রাঃ	২	২
৩৮-৫৪	৩	৭০০ মিঃ গ্রাঃ	৩	৩
৫৫-৭০	৪	১ গ্রাঃ	৪	৩
>৭০	৫	১ গ্রাঃ	৫	৪

♣ ইনজেকশন Streptomycin ডোজ ৫০ বৎসরের উর্দ্ধে ৭৫০ মিঃ গ্রাঃ এর অধিক হবে না।

নিয়মিত, ক্রমাগত, সঠিক মাত্রায় ও পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার গুরুত্বঃ

নিয়মিত, ক্রমাগত, সঠিক মাত্রায় এবং পূর্ণ মেয়াদে চিকিৎসা সম্পূর্ণ করলে যক্ষ্মা রোগ সম্পূর্ণ ভাল হয়। কিছুদিন চিকিৎসার ফলে ঔষধের কার্যকারিতা কমে বা একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।অনিয়মিতচিকিৎসারফলে রোগীর যক্ষ্মা অনিরাময়যোগ্য এমনকি মৃত্যুর কারণও হতে পারে।

যক্ষ্মার ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া ঃ

যক্ষ্মার ঔষধের সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে ধারণা দেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সম্ভাব্য পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার কারণে রোগী ঔষধ সেবন বন্ধ করে দিতে পারেন। অপরদিকে ঔষধের পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে রোগী ডাক্তারের পরামর্শ অনুসরণে উৎসাহিত নাও হতে পারেন যার কারণে শারিরীক অবস্থা জটিল আকার ধারণ করতে পারে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া গুরুতর নয় এবং কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না; রোগীকে আশ্বস্ত করাই যথেষ্ট। পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া গুরুতর আকার ধারণ করলে সাথে সাথে ঔষধ সেবন বন্ধ করে দিতে হবে এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।

পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া	ব্যবস্থাপনা
গুরুতর নয়	
১। বমি বমি ভাব ২। কমলা/লাল প্রস্রাব ৩। গিরায় ব্যাথা	রোগীকে আশ্বস্ত করুন, নিয়মিত ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিন। রোগীকে আশ্বস্ত করুন, নিয়মিত ঔষধ সেবনের পরামর্শ দিন। রোগীকে আশ্বস্ত করুন। প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ খাওয়ার পরামর্শ দিন।
গুরুতর	
• মাথা ঘোরানো • কানে ঝিন ঝিন শব্দ হওয়া • চামড়ায় ফোস্কা, চুলকানি • ক্রমাগত বমি • চোখে ঝাপসা দেখা • চামড়া এবং চোখের হলুদ রং	এ সকল ক্ষেত্রে বিলম্ব না করে জরুরী ভিত্তিতে রোগীকে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠাতে হবে এবং সম্ভব হলে সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।

DOTSএর সুবিধাসমূহ ঃ

- DOTS স্বল্প খরচে একটি কার্যকর চিকিৎসা পদ্ধতি।
- প্রতিদিন ঔষধ গ্রহণ নিশ্চিত হয়।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে যক্ষ্মা রোগীর রোগ নিরাময়ের হার প্রায় ১০০ ভাগ।
- এই চিকিৎসা কৌশল প্রচলিত অন্যান্য স্বাস্থ্য সেবার সাথে সমন্বিত করে অধিক সংখ্যক যক্ষ্মা রোগী জাতীয় যক্ষ্মা নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির আওতায় আনা সম্ভব।
- প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবক সহজেই DOTS পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন।
- এই পদ্ধতিতে রোগীর হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজন হয় না; রোগী পরিবারের সদস্যদের সাথে বসবাস করতে পারেন এবং চিকিৎসা শুরুর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে কাজে যোগদান করতে পারেন।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে ঔষধের অকার্যকারিতা (Drug Resistance) এড়ানো যায় যা জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ এবং চিকিৎসা প্রায় ১০০ গুন ব্যয় বহুল।
- ঔষধ সেবনে সমস্যা হলে শ্রীঘ্র ব্যবস্থা নেয়া যায়।
- এই পদ্ধতির মাধ্যমে সহজে প্রতিটি রোগীর চিকিৎসা পদ্ধতি লিপিবদ্ধ ও অনুসরণ করে রোগীর আরোগ্য নিশ্চিত করা যায়।

চিকিৎসার ফলাফল নিরীক্ষণঃ

কাট্যাগরি-১ এর ক্ষেত্রে রোগীর অসুখের অবস্থা দেখা বা বুঝা এবং ঔষধের কার্যকারিতা অনুধাবনের জন্য চিকিৎসা শুর করার ২ মাস পর, ৫ মাস পর ও ৬ মাসের শুরুতে রোগীর কফ অবশ্যই পরীক্ষা করতে হবে। ২ মাস চিকিৎসা শেষে কফে জীবাণু পাওয়া গেলে ৩ মাস চিকিৎসা শেষে আরো একবার কফ পরীক্ষা করতে হবে। ক্যাটাগরি-২ এর ক্ষেত্রে চিকিৎসা শুরু করার ৩ মাস পর (প্রয়োজনে ৪ মাস পর), ৫ মাস পর ও ৮ মাসের শুরুতে রোগীর কফ পরীক্ষা করতে হবে। এ কফ পরীক্ষার উপর রোগীর চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠা নির্ভর করে। ফুসফুস বহির্ভূত যক্ষা রোগীদের চিকিৎসা শুরু করার পর আর কফ পরীক্ষার প্রয়োজন হয় না।

পাঠ-২
কৃমি

কৃমি কি?

কৃমি এক প্রকার পরজীবি প্রাণী। এরা নিজেদের খাবার নিজেরা তৈরী করতে পারেনা। এরা অন্য প্রাণীর শরীর থেকে খাদ্য গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে।

কৃমিরপ্রকারভেদ ঃ

আমাদের দেশে সাধারণতঃ ৪ ধরনের কৃমি বেশী দেখাযায়।

১. গোল কৃমিবা কেঁচো কৃমি(Round worm)

২. সুতা কৃমি(Thread worm)

৩. চাবুক কৃমি(Whip worm)

৪. বক্র কৃমি(Hook worm)

প্রকারভেদে কৃমিরউপসর্গ ও লক্ষণঃ

গোলকৃমিবা কেঁচো কৃমি

প্রাপ্তবয়স্ক কেঁচো কৃমি খুব বড়। ২০-৩৫ সে.মি(৮-১৪ ইঞ্চি) লম্বা এবংপুরোক্ষুদ্রান্ত্রজুড়ে থাকে। গোল কৃমিরডিমপায়খানার সাথে বেরহয়। গোল কৃমিরডিম ভেজা ও উষ্ণমাটিতেভালভাবে বেঁচে থাকে। যত্রতত্রপায়খানাকরলে এ ডিমখাবারবাপানিকে দূষিতকরে। এ দুষিতখাবারবাপানি কোন ব্যক্তি গ্রহণকরলে এ ডিম থেকে পর্যায়ক্রমে শিশু কৃমিরসৃষ্টিহয়।

উপসর্গ ও লক্ষণ

১. অন্ত্রে কৃমি থাকলেখাবারহজমহয়নাএবংশরীর দূর্বললাগে।

২. কৃমিরকারণেবমিবমিভাব, পেটে ব্যথা ও অনিয়মিতপায়খানাহতেপারে।

৩. অনেকসময়বমিকিংবাপায়খানার সাথে কৃমিপড়তেপারে।

৪. শিশুদের পেটেযদি বেশী কৃমি থাকেতবে পেটবড়হয়, খাওয়ারঅরুচি ও অপুষ্টিহতেপারে।

৫. কৃমিআক্রান্ত লোকেরশুকনোকাশিওহতেপারে।

সুতা কৃমি

প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমি প্রায় এক সেন্টিমিটার বা অর্ধ ইঞ্চি লম্বা হয় এবং বৃহদান্ত্রের শেষ ভাগে বসবাস করে। রাতে স্ত্রী কৃমি পায়াখানার রাস্তার বাইরে এসে ডিম পাড়ে এবং এতে খুব অস্বস্তিকর চুলকা নিহয়। ডিমগুলো আঙ্গুল বা বিছানার কাপড়ের মাধ্যমে সংক্রমিত ব্যক্তির অথবা পরিবারের অন্য ব্যাক্তিদের মুখে যায়। ফলে সংক্রমিত ব্যক্তি পুণরায় সংক্রমিত হওয়া ছাড়াও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা কৃমিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রী বক্র কৃমির ডিম সংক্রমিত ব্যক্তিদের পায়খানার সাথে বেরিয়ে আসে, স্যাঁত-স্যাঁতে মাটিতে এ ডিম খুব ভালভাবে বেঁচে থাকতে পারে।

উপসর্গ ও লক্ষণ :

১. সুতো কৃমি রাতের বেলায় মলদ্বারের কাছে ভীড় জমায় তাই মলদ্বাওে চুলকানি হয়। বিশেষ কওে রাতের বেলায়এটা বেশি হয়।

২. মলের সাথে ছোট ছোট সুতোর মতো কৃমিযায়

৩. মহিলাদের বিশেষ করেবাচ্চা মেয়েদের যোনি পথে ও প্রস্রাবের রাস্তায় সংক্রমণ ও চুলকানি হয়

বক্র কৃমি

প্রাপ্তবয়স্ক বক্র কৃমি এক সে.মি. লম্বা হয় এবং ক্ষুদ্রান্ত্রের উপরি ভাগে বসবাস করে। এদেও মাথা বড়শির মত অন্ত্রের গায়ে লেগে থাকে। এরা রোগীর শরীর থেকে রক্ত এব ংআমিষ চুষে নেয়।

যত্র তত্র পায়খানা করলে নির্গত ডিমগুলো থেকে বাচ্চা বক্র কৃমি জন্ম নেয় এবং সেখানেই অবস্থান করে। খালিপায়ে সে জায়গায় হাটাহাটি করলে বাচ্চা বক্র কৃমিগুলো পায়ের চামড়া ভেদ করে শরীরে প্রবেশ করে এবং লসিকা এবং রক্তের সঙ্গে প্রবাহিত হয়ে ফুসফুসে প্রবেশ করে। কাল ক্রমে বাচ্চা কৃমিতে পরিণত হয়। বাচ্চা কৃমি বায়ুকোষ থেকে উপরের দিকে শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে এবং খাদ্য নালীতে গিয়ে ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করে এবং প্রাপ্ত বয়স্ক কৃমিতে পরিণত হয়।

উপসর্গ ও লক্ষণ

১. কৃমি ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করলে বমি এবং উপরের পেটে ব্যথা অনুভূত হয়।

২. অনেক সময় পাতলা পায়খানা হয়।

৩. ঈুষ্টিহীন শিশুদের রক্তস্বল্পতা ও পুষ্টিহীন তারমাত্রা বেড়ে যায়।

৪. শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়।

চাবুক কৃমি

চাবুক কৃমি দেখতে চাবুকের মত।এরা ৩৫ থেকে ৫০ সে.মি.পর্যন্ত লম্বা হয়,এদের দুটো অংশ, একটি সরু অংশ ও অন্যটি মোটা অংশ, ৩/৫ ভাগ সরু এবং ২/৫ ভাগ মোটা। সরু অংশ বৃহদন্ত্রের দেওয়ালে ঢুকিয়ে এরা সেখান থেকে খাদ্য খায়। ফলে অন্ত্রের থেকে ক্রমাগত রক্তপাত হতে থাকে। দীর্ঘদিন রক্তপাত হলে সহজেই রক্ত স্বল্পতা বা এ্যানিমিয়া দেখা দেয়।

উপসর্গ ও লক্ষণ

- পেটেরডানদিকে ব্যথা করে
- মাঝেমাঝেডায়রিয়াহয়
- বদহজমহয়

কৃমি মানুষের শরীরে যে সব জটিলতা সৃষ্টি করে ঃ

অনেক বেশী কৃমি হলে শিশু অপুষ্টিতে ভোগে কারণ কৃমি খাবার ও রক্ত খেয়ে ফেলে। বক্রকৃমি হলে মারাত্মক রক্ত স্বল্পতা দেখা দিতে পাওে ফলে হার্ট ফেইলিওর পর্যন্ত হতে পারে। কেঁচো কৃমি বেশীহলে অন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারাত্মক জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্রের যোগস্থল সরু জায়গায় (যেখানে ক্ষুদ্রান্ত্র বৃহদান্ত্রে প্রবেশকরে) অনেক গুলো কৃমি দলা পাকিয়ে বলের মত হয়ে যেতে পারে এবং অন্ত্রের নালী পুরোপুরি বন্ধ কওে দিতে পারে। তখন শিশু খুব অসুস্থ হয়ে যায়। পেটে অসহ্য ব্যথা হয় এবং কোষ্ঠকাঠিন্য হয়। এমনকি পায়খানা পুরোপুরি বন্ধ হয়ে পেট ফুলে যেতে পারে। এ অবস্থায় সুচিকিৎসা করা না হলে শিশুর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

কৃমি প্রতিরোধ ঃ

১) স্বাস্থ্য রক্ষার নিয়মাবলী শিক্ষা দান- যা বাড়ীর সকলের জন্য নিশ্চিত করতে হবে-
  - বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।
  - খাবার আগে হাত সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।
  - পায়খানা থেকে ফেরার পওে হাত ছাই বা সাবান দিয়ে ধুতে হবে।
  - যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করে স্বাস্থ্য সম্মত উপায়ে বানানো পায়খানায় মলমূত্র ত্যাগ করার অভ্যাস করতেহবে।
  - খালি পায়ে পায়খানায় না যাওয়া এবং শিশুদের সব সময় স্যান্ডেল পরে হাঁটাচলা নিশ্চিত করতে হবে।

২) কৃমিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরকে তাড়াতাড়ি চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করা, বিশেষকরে যে সমস্ত পরিবার সুতা কৃমির দ্বারা প্রায়ই আক্রান্ত হয সে সব পরিবারের সকলসদস্য কে এক সাথে চিকিৎসা করতে হবে।

৩) হাতের নখ নিয়মিত (ছোটকরে) কাটতে হবে এবং মায়েদেরকে খাবার তৈরী এবং পরিবেশনের আগে হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

৪) শাক-সবজি ফলমুল বিশুদ্ধ/পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে খেতে হবে।

রোগ নির্ণয়ের জন্য সহায়ক লক্ষণ ঃ

- পেটে ব্যথা, বদহজম
- শিশুর পেট বড় হয়ে যাওয়া
- পায়খানা ও বমির সাথে কৃমি বের হওয়া।
- রক্ত স্বল্পতা, দুর্বলতা, ধীরে ধীরে ওজন কমে যাওয়া।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষাঃ

- খুব সহজে এবং কম খরচে একটি পরীক্ষা দ্বারা দেহে কৃমির উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন মলের সাধারণ আনুবীক্ষণিক পরীক্ষা (Stool for routine and microscopic examination- Stool R/M/E)
- মলের Floatation Test দ্বারা আরো সঠিকভাবে মলে কৃমির ডিম্বের (Ova) উপস্থিতি নির্ণয় করা যায়। উপরি-উক্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য শুধু ডাক্তারগণ পরামর্শ দিতে পারবেন

চিকিৎসা ঃ

এলবেনডাজল

বড়দেরঃ এলবেনডাজল ৪০০ মিঃগ্রাঃ, ১টি ট্যাবলেট ১ বার

শিশু (এক থেকে দুইবৎসর পর্যন্ত)ঃএলবেনডাজল সিরাপ ১চা চামচ(২০০মিঃগ্রাঃ/৫ এমএল) ১ বার

শিশু (দুই বৎসরের উপরে বয়স) ঃএলবেনডাজল সিরাপ ২চা চামচ(৪০০মিঃগ্রাঃ/১০এমএল) ১ বার অথবা এলবেনডাজল ৪০০ মিঃগ্রাঃ, ১টি ট্যাবলেট ১ বার

চিকিৎসার ৩ সপ্তাহের মধ্যে যদি রোগী সুস্থ না হয় তবে ২য় কোর্স দিতে হবে।

রক্তস্বল্পতা দেখা দিলে আয়রন ও ফলিক এসিড বড়ি দিয়ে চিকিৎসা দিতে হবে।

গর্ভবতী মায়েদের দেওয়া যাবেনা।

এক বৎসরের কম বয়সী শিশুদের দেওয়া যাবেনা।

পাঠ-৩
ডেঙ্গু জ্বর (Dengue Fever)

ডেঙ্গু জ্বর কি?

ডেঙ্গু জ্বর ভাইরাস জনিত একটি রোগ। এডিস (Aedes) প্রজাতির মশার কামড়েই সাধারণত ডেঙ্গু জ্বর ছড়ায়। ডেঙ্গু আক্রান্ত কোনো ব্যক্তিকে কামড়ানোর মাধ্যমে এডিস মশার দেহে ডেঙ্গু ভাইরাস ঢোকে। একই মশা আবার সুস্থ কোনো ব্যক্তিকে কামড়ালে ডেঙ্গু জীবাণু তার দেহে প্রবেশ করে।

প্রকারভেদ ঃ

ডেঙ্গু জ্বর দু ধরনের হয়ে থাকে।

১. **ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর**

২. **হেমোরেজিক ডেঙ্গুজ্বর**

ডেঙ্গু জ্বরের উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ ঃ

ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর বা সাধারণ পর্যায়	হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর বা জটিল পর্যায়
▪ উচ্চমাত্রার জ্বর সাধারণত ৩ থেকে ৭ দিন থাকে। ▪ জ্বর সাধারণত ১০৪/১০৫ ডিগ্রী ফারেনহাইট পর্যন্ত হওয়া ▪ জ্বর একেবারে চলে গিয়ে পুনরায় আসতে পারে। ▪ মাথা, চোখ ও চোখের চারিদিকে ব্যথা হওয়া ▪ চোখের মনি লালচে হওয়া ▪ ক্লান্তিবোধ হওয়া ▪ অবসাদ, উদ্যমহীনতা দেখা যাওয়া ▪ মাংসপেশী, হাড় ও মেরুদন্ডে ব্যথা হওয়া ▪ বমি বমি ভাব কিংবা বমি হওয়া ▪ খাবার খেতে অনীহা হওয়া	▪ চামড়ার উপর লালচে ফুসকুড়ি পড়া ▪ নাক, মুখ ও দাঁতের মাড়ি দিয়ে রক্ত পড়া, চামড়া বিবর্ণ হওয়া ▪ বমির সাথে রক্ত যাওয়া ▪ রক্ত মিশ্রিত কালো পায়খানা হওয়া ▪ অনিদ্রা এবং ক্লান্তিবোধ হওয়া ▪ প্রচন্ড ব্যথায় অনবরত ক্রন্দন ▪ পায়ের চামড়া ফ্যাকাশে, মলিন, ঠান্ডা ও আঠালো হয়ে যাওয়া ▪ অতিরিক্ত পানির পিপাসা ▪ শ্বাস প্রশ্বাসে কষ্ট ▪ মুর্ছা যাওয়া ▪ রক্তক্ষণের ফলে হাইপোভলিউমিক শকে (অজ্ঞান

ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কোমর ব্যাথা, অস্থিসন্ধি বা জয়েন্টে ব্যথা, চোখের পিছনে ব্যথা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে হাড়ব্যথা এতটাই প্রচন্ড হয় যে, মনে হয় হাড় ভেঙ্গে গেছে। এ কারণে এই জ্বরকে "ব্রেক বোন ফিভার" বলা হয়ে থাকে।

সাধারণত ১৫ বছরের নীচে যাদের বয়স তারাই মারাত্মক হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরে বেশী আক্রান্ত হয়। **হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত রোগীর ক্ষেত্রে সাধারণতঃ** জ্বর ছাড়ার পরই রোগীর রক্তক্ষরণ শুরু হয়। এ বিষয়ে ডেঙ্গু রোগীদের সতর্ক থাকতে হবে। বিশেষজ্ঞরা জ্বর সেরে যাওয়ার পরের সময়টিকেই বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন। অন্যান্য সাধারণ জ্বরের ক্ষেত্রে জ্বর কমে যাওয়ার মানেই হচ্ছে কিছুটা সুস্থবোধ হওয়া। কিন্তু ডেঙ্গু জ্বরের ক্ষেত্রে এটা ব্যতিক্রম। জ্বর সেরে যাওয়ার পরই রোগীর প্রতি অধিক যত্নশীল ও সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

চিকিৎসাঃ

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসায় এখনও কোন সুনির্দিষ্ট ঔষধ নেই। তবে সঠিক সময়ে যথাযথ সহায়ক চিকিৎসায় রোগীদের মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। ক্লাসিক্যাল এবং হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর উভয় ক্ষেত্রেই চিকিৎসা উপসর্গ লক্ষণ অনুযায়ী করতে হবে।

১. **ক্লাসিক্যাল ডেঙ্গু জ্বর সাধারণত** ৭ দিনের মধ্যে এমনিতেই সেরে যায়। এইক্ষেত্রে উপসর্গ অনুযায়ী চিকিৎসা করা হয়। যেমন- ব্যথার জন্য প্যারাসিটামল, বমির জন্য স্টেমিটিল জাতীয় ঔষধ দেয়া যেতে পারে। এছাড়া ডেঙ্গু জরে প্রচুর পানি পান করতে হবে। প্রয়োজনে খাবার স্যালাইন বা শিরাপথে স্যালাইন দিতে হবে। তবে সেরে যাওয়ার পর রোগীর দূর্বলতা, ক্ষুধামন্দা, বিষন্নতা দেখা দিতে পারে যা পরবর্তীতে সেরে যায়।

২. **হিমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর হয়েছে** সন্দেহ হলে রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগীর রক্তের প্লেটিলেট কাউন্ট (Platelet Count) এবং পিসিভি (প্যাকড্ সেল ভলিউম/Packed Cell Volume) পরীক্ষা করাতে হবে। হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর প্লেটিলেট কাউন্ট কমে যেতে পারে। প্লেটিলেট কাউন্ট ১০ হাজারের নীচে কমে আসলে রোগীকে শিরাপথে প্লেটিলেট ট্রান্সফিউশন করতে হবে এবং প্রতিদিন ১ বার করে প্লেটিলেট কাউন্ট পরীক্ষা করতে হবে। আর যদি রোগীর প্রত্যক্ষ রক্তক্ষরণ থাকে (যেমন-রক্ত মিশ্রিত কালো রং এর পায়খানা, রক্তবমি হওয়া, নাক দিয়ে প্রচুর পরিমাণে রক্তক্ষরণ হওয়া ইত্যাদি) তাহলে সেক্ষেত্রে রোগীকে রক্ত দেয়া যেতে পারে। সঠিক সময়ে ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা নিলে খুব সহজেই এর জটিলতাগুলো এড়ানো যায় ও রোগী দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠে।

মনে রাখতে হবে, ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর ব্যথার জন্য কোন অবস্থাতেই এসপিরিন বা এইসপ্লাস জাতীয় ঔষধ দেয়া যাবে না, কারণ এতে রক্তক্ষরণের প্রবণতা/জটিলতা বেড়ে যায়।

একবার ডেঙ্গু জ্বর হলে আবার ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে কিনা ঃ

ডেঙ্গু ভাইরাসের ৪টি সেরোটাইপ রয়েছে। এই ৪টির মধ্যে যে কোন একটি সেরো টাইপ ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার পর সুস্থ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে এই ভাইরাসটিতে আবার আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থাকে না। কিন্তু বাকি তিনটি সেরোটাইপ ভাইরাসের যে কোনটিতে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি রয়ে যায়। তাই একবার ডেঙ্গু জ্বর হলেও আবার ডেঙ্গু জ্বর হতে পারে।

বাংলাদেশে ডেঙ্গু জ্বর ঃ

জানা যায়, পঞ্চাশের দশকে একবার এক ধরণের তীব্র জ্বরের প্রকোপ দেখা দিয়েছিল। ১৯৬৪ সালে ঢাকায় বিশেষ ধরণের জ্বরের প্রকোপ বিশেষজ্ঞদের কাছে ধরা পড়ে। তখন সে জ্বরের কোন কারণ খুজেঁ না পেয়ে বিশেষজ্ঞরা তাকে 'ঢাকা ফিভার' নামে অভিহিত করেছিলেন। ধারণা করা হয় এই জ্বরটিও ছিল ডেঙ্গু জ্বর। বিশেষজ্ঞদের মতে ডেঙ্গু জ্বরের সেটাই ছিল বাংলাদেশে প্রথম আক্রমণ। তারপর ১৯৯৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকাসহ অন্যান্য বড় শহরে আবার ডেঙ্গু জ্বরের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

সাধারণত জুন মাসের মাঝামাঝি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গড়ে ৪০০০-৫০০০ ডেঙ্গু জ্বরের রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয় এবং প্রায় ১% হারে মারা যায়।

ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ ঃ

নীলাভ কালো দেহে সাদা ডোরা কাটার দাগ সম্পন্ন এডিস নামে এক জাতীয় মশা ডেঙ্গু জ্বরের প্রধান উৎস। সুতরাং এই মশার দমনই হচ্ছে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়।

- ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে কামড়ানো যে কোন মশার কামড় হতে ও ডেঙ্গু ছড়াতে পারে। সুতরাং ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে অবশ্যই সর্বক্ষণ মশারীর মধ্যে রাখতে হবে যাতে করে রোগীকে কোন মশা কামড়াতে না পারে।
- এডিস মশা সাধারণত ভোরে এবং সন্ধ্যা নামার পূর্বক্ষণে কামড়ায়। তাই রাতে এমনকি দিনের বেলাতেও ঘুমাবার সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে।
- ঘরবাড়ি ও তার আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে ও মশক নিধন অভিযান চালাতে হবে।
- বাসস্থানে ফুলের টব, অব্যবহৃত কৌটা, ডাবের খোসা, অব্যবহৃত টায়ার, মুখ খোলা পানির ট্যাঙ্ক, প্লাষ্টিকের প্যাকেট, পলিথিন এবং ঘরের আশেপাশে পানি জমতে দেয়া যাবে না।

পাঠ-৪

জিকা ভাইরাস (Zika Virus)

মে ২০১৫, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ব্রাজিলে প্রথম জিকা ভাইরাস নামক নতুন একটি ভাইরাস সংক্রমণের প্রতিবেদন প্রকাশ করে, এর পর থেকে ১৫ জানুয়ারি ২০১৬ পর্যন্ত আমেরিকার প্রায় ১৪টি দেশে এই ভাইরাস

ছড়িয়ে পড়ার খবর পাওয়া গেছে। ধারণা করা হচ্ছে এই অঞ্চলের আরো কিছু দেশ সহ বিশ্বের আরো কিছু অঞ্চলে দ্রুত এই ভাইরাস ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ইতিহাসঃ

নব উদ্ভুত জিকা ভাইরাস (Zika Virus) সংক্রমণ একটি মশা বাহিত রোগ, যা এডিস প্রজাতির মশার মাধ্যমে ছড়ায়। উগান্ডাতে "জিকা" নামক একবনের বানর (Rhesus Monkey) ও এডিস প্রজাতির মশার শরীরে ১৯৪২ সালে ভাইরাসটি প্রথম সনাক্ত হয়েছিল বলে বনটির নামেই এর নাম জিকা ভাইরাস রাখা হয়েছে। এরপর ১৯৫২ সালে পর্যায়ক্রমে উগান্ডা এবং তানজিনিয়ায় এটি মানুষের শরীরেপাওয়া যায়। এখন পর্যন্ত আফ্রিকা, আমেরিকা, এশিয়া ও প্যাসিফিক অঞ্চলে এর প্রাদুর্ভাবের খবর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থায় রয়েছে।

জিকা ভাইরাস কি এবং কিভাবে ছড়ায়ঃ

ইহা ফ্ল্যাভিভাইরাস (Flavivirus) পরিবার ভুক্ত একটি ভাইরাস যা এডিস এজিপ্টি (Aedes Aegypti) মশার মাধ্যমে আক্রান্ত মশা থেকে মানুষে এবং আক্রান্ত মানুষ থেকে মশায় ছড়ায়। এই একই প্রজাতির মশার মাধ্যমেই ডেঙ্গু, চিকনগুনিয়া এবং ইয়োলো ফিভার (Yellow fever) রোগ ছড়ায়। এডিস মশা সাধারণত দিনের বেলা মানুষকে আক্রমন করে এবং এই মশা সাধারণত বদ্ধ পানি যেমনঃ ফুলের টব, পরিত্যাক্ত টায়ার-এ জমা পানিতে বংশ বিস্তার করে।

রোগের লক্ষণসমূহঃ

জিকা ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণগুলো আর অন্য সকল ফ্লু ভাইরাস সংক্রমণের লক্ষণের মতই, যেমনঃ মৃদু জ্বর, শরীরের জয়েন্টে ব্যথা, মাথা ব্যথা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া এবং ত্বক বা চামড়ায় লাল লাল গুটি কিংবা ফুস্কুরি উঠা। যেহেতু লক্ষণগুলো একই তাই রোগের ইতিহাস নেয়ার সময় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাস নিতে হবে, তা হল বিগত ২ সপ্তাহের মধ্যে জিকা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব অঞ্চলে ভ্রমণের ইতিহাস কিংবা ২ সপ্তাহের মধ্যে জিকা ভাইরাস আক্রান্ত লোকের সংস্পর্শে আসা। সাধারণত আক্রান্ত ৫ জনের মধ্যে একজনের মাঝে এর লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং কয়েকদিন থেকে এক সপ্তাহের মধ্যে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।

জটিলতাঃ

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য মতে জিকা ভাইরাসের সংক্রমণে কিছু রোগীর মধ্যে বিরল স্নায়ুরোগ গুলেন বারি সিন্ড্রোম (Gullen Bari Syndrome) হতে দেখা গেছে এবং এখন পর্যন্ত এই সিন্ড্রোমে ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এই বার ব্রাজিলে জিকা ভাইরাস প্রাদুর্ভাব যে কারণে বেশি ভয়াবহ তা হলো, অনেক গর্ভবতী মা যারা জিকা ভাইরাস সংক্রমিত হয়েছে তাদের অনেকের গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হয়ে গেছে এবং অনেকের সন্তান তুলনামূলক ছোট মাথা বা মাইক্রসেফালি (Microcephali) নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছে। ১৫ জানুয়ারি, ২০১৬ পর্যন্ত, ব্রাজিলে প্রায় ৩৫০০ শিশু মাইক্রসেফালি নিয়ে জন্ম নিয়েছে। তবে এটা নিশ্চিত নয় যে কতজন সংক্রমিত মায়ের সন্তান

মাক্রসেফালি নিয়ে জন্ম নিচ্ছে কিংবা গর্ভের কোন সময়টায় সংক্রমিত হলে বাচ্চা'র মাইক্রসেফালি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি, এই নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। এছাড়াও সম্প্রতি জানা গেছে যে, যৌন সংস্পর্শেও জিকা ভাইরাস ছড়াতে পারে এবং এভাবে একজন রোগীর সংক্রমণের খবরও পাওয়া গেছে। খুব সম্প্রতি আরো জানা গেছে এই ভাইরাস মায়ের দুধেও থাকে, তবে কি পরিমাণ থাকে ও তা শিশুতে রোগ সংক্রমণ করে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত না।

রোগ নিরুপণঃ

আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সিরাম এ RT-PCR পরীক্ষা করে জিকা ভাইরাস সংক্রমণ নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু এই পরীক্ষা এখন পর্যন্ত শুধু মাত্র বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত অল্প কছি ল্যাবরেটরিতেই করা সম্ভব। এছাড়াও রোগের লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার ৪ দিন পর রক্তে Zika virus IgM antibody পরীক্ষা করেও জিকা ভাইরাস সংক্রমণ জানা যায়, কিন্তু সমস্যা হলো অন্যান্য ফ্লাভিভাইরাস(Dengue, Yellow fever) এর সংক্রমণ হলেও Zika virus IgM antibody পজেটিভ হতে পারে। জিকা ভাইরাস সনাক্তকরনে আমাদের সাধারণ ল্যাবরেটরিতেকরা যায় এমন কোনও পরীক্ষা এখন পর্যন্ত নাই।

চিকিৎসাঃ :

দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, এখন পর্যন্ত জিকা ভাইরাস সংক্রমণের সুনির্দিষ্ট কোনও চিকিৎসা নাই। অন্যান্য ফ্লু ভাইরাসের অসুস্থতায় যে চিকিৎসা এর বেলায়ও তাই। শরীরের তাপমাত্রা কমানোর জন্য প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষধ ব্যবহার করা যেতে পারে। আর সতর্কতা হিসেবে, ডেঙ্গু রোগ নয় নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোনও রকম ব্যথানাশক ঔষধ ব্যবহার না করা উচিৎ। যেহেতু এই রোগে ডেঙ্গুর মত রক্তের অণুক্রিকা (Platelet) কমে যায় না তাই রক্ত পরিসঞ্চালনের (blood transfusion) প্রয়োজন পরে না। সাধারণত এই রোগে হাসপাতালে ভর্তির প্রয়োজনও তেমন একটা হয় না।

প্রতিরোধ ও সাবধানতাঃ

যেহেতু জিকা ভাইরাস একটি মশা (Aedes Aegypti)বাহিত রোগ এবং এই একই মশা'র মাধ্যমে ডেঙ্গু রোগও ছড়ায়। তাই ডেঙ্গু প্রতিরোধে যে ব্যবস্থা নেওয়া হতো এর ক্ষেত্রেও তাই।

১) মশার কামড় থেকে নিজেকে রক্ষা করতে হবে, এর জন্য জিকা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব আছে এমন অঞ্চলে থাকলে লম্বা জামা পরা উচিৎ যেন হাত ও পা সম্পূর্ণ ঢাকা থাকে। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে। আর বাচ্চা ও বয়স্ক মানুষ যারা নিজেকে রক্ষা করতে পারে না তাদের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

২) এডিস মশা'র বংশ বিস্তার রোধের ব্যবস্থা নিতে হবে। এডিস মশা সাধারণত বদ্ধ পানি যেমন-ফুলের টব বা পরিত্যাক্ত টায়ারে জমে থাকা স্বচ্ছ পানিতে বংশ বিস্তার করে। তাই বাড়ির আশে-পাশে এই ধরনের পানি জমা থাকলে তা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সতর্কতা জারি করেছে এবং তার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। আর ব্রাজিল জিকা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমাদের দেশে এডিস মশা রয়েছে ফলে আমরাও যথেষ্ঠ ঝুঁকির মধ্যে রয়েছি। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সরকার ও স্বাস্থ্য বিভাগ যথাযথ সতর্ক ব্যবস্থা নিয়েছে। দেশে থেকে এডিস মশার রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে এর মধ্যে যথাযথ পরীক্ষাগারে পাঠানো হয়েছে, যদি এতে জিকা ভাইরাস পাওয়া যায় তবে সন্দেহভাজন মানুষের রক্ত পরীক্ষা হবে।

পাঠ-৫
ম্যালেরিয়া(Malaria)

ম্যালেরিয়া কি?

ম্যালেরিয়া এক প্রকার পরজীবি দ্বারা সংঘটিত সংক্রামক রোগ যা স্ত্রী এনোফিলিস (Anopheles) মশা দ্বারা ছড়ায়।

বাংলাদেশের উত্তর ও পূর্ব দিকের সীমান্ত অঞ্চল বিশেষ করে তিন পার্বত্য জেলা (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি), চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, ময়মনসিংহ, শেরপুর এবং কুড়িগ্রাম জেলায় ম্যালেরিয়ার প্রাদুর্ভাব সর্বাধিক। এসব এলাকায় সারা বছরই কম বেশী ম্যালেরিয়া বিস্তার লাভ করে থাকে। তবে বর্ষা মৌসুমের শুরু ও শেষ দিকে ম্যালেরিয়ার বিস্তার বেশী হয়ে থাকে।

যারা এই রোগে মৃত্যুবরণ করে তাদের অধিকাংশ শিশু ও গর্ভবতী মহিলা।

ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ চক্র ঃ

প্লাজমোডিয়াম জাতীয় পরজীবি শরীরে প্রবেশ করলে ম্যালেরিয়া রোগ হয়। এই প্লাজমোডিয়াম একজন রোগী হতে আর একজন সুস্থ লোকের শরীরে এক প্রকার এনোফিলিস জাতীয় স্ত্রী মশা (ভেক্টর/vector) দ্বারা সংক্রমিত হয়। ভেক্টর মশা ম্যালেরিয়া রোগীকে কামড়ানোর সময় রক্তের সাথে পরজীবি (ম্যালেরিয়া জীবাণূ) গ্রহণ করে এবং ১০-১৪ দিনের মধ্যে জীবাণু বংশ বৃদ্ধি হয় এবং মশাটি সংক্রমণক্ষম হয়ে পড়ে। এই সংক্রমণক্ষম মশা সুস্থ মানুষকে কামড় দিলে তার শরীরে ম্যালেরিয়া পরজীবি প্রবেশ করে এবং সেই ব্যক্তি ৮-১০ দিনের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ ব্যক্তি চিকিৎসা প্রাপ্ত না হলে বাহক রোগীতে পরিণত হয়। এই রোগীকে ভেক্টর মশা কামড়ানোর সময় ম্যালেরিয়া পরজীবি গ্রহণ করে। এইভাবে ম্যালেরিয়া সংক্রমণ চক্র চলতে থাকে।

বাংলাদেশে প্রধানতঃ দুই প্রজাতির প্লাজমোডিয়াম রয়েছে -

১। প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স (Plasmodium vivax)

২। প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম (Plasmodium falciparum)

এই দুইটি প্রজাতির মধ্যে প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম হচ্ছে মারাত্মক। কারণ প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম দ্বারা মারাত্মক ম্যালেরিয়া (Severe Malaria) হয়ে থাকে এবং উপযুক্ত চিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে।

চিকিৎসা ঃ

ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া

রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা প্রদানের জন্য ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়াকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে -

১। জটিলতা বিহীন ম্যালেরিয়া (Uncomplicated Malaria-UM)

২। মারাত্মক ম্যালেরিয়া (Severe Malaria-SM)

ম্যালেরিয়া দ্রুত নির্ণয় করে চিকিৎসা প্রদান করলে মারাত্মক ম্যালেরিয়ার হার কমে যাবে এবং ম্যালেরিয়া জনিত মৃত্যুর হারও হ্রাস পাবে।

জটিলতা বিহীন-ম্যালেরিয়া (Uncomplicated Malaria-UM)

ম্যালেরিয়া প্রবণ এলাকায় যদি কোন রোগীর গত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জ্বর বা জ্বরের ইতিহাস থাকে এবং জ্বরের অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কারণ না থাকে, তখন ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া হিসেবে ধারণা করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে রোগীকে হাসাপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে। যদি Blood Slide Examination (BSE) বা Rapid Diagnostic Test (RDT) ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার জন্য পজিটিভ হয়, তবে রোগীকে (Uncomplicated Malaria-UM) হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে।

কো-আর্টেম/Coartem (আর্টিমিথার + লুমিফ্যানট্রিন) ট্যাবলেট দিয়ে ডোজ চার্ট অনুযায়ী এই রোগীর চিকিৎসা করতে হবে।

ওজন অনুযায়ী কো-আর্টেমের ডোজ চার্ট

ওজন (বয়স, বৎসর)	ট্যাবলেটের সংখ্যা ডোজের আনুমানিক সময়					
	৩ ঘন্টা	৮ ঘন্টা	২৪ ঘন্টা	৩৬ ঘন্টা	৪৮ ঘন্টা	৬০ ঘন্টা
৫-১৪ (<৩)	১ ট্যাবলেট	১ ট্যাবলেট	১ ট্যাবলেট	১ ট্যাবলেট	১ ট্যাবলেট	১ ট্যাবলেট
১৫-২৪(৩-৯)	২ ট্যাবলেট	২ ট্যাবলেট	২ ট্যাবলেট	২ ট্যাবলেট	২ ট্যাবলেট	২ ট্যাবলেট
২৫-৩৪(৯-১৪)	৩ ট্যাবলেট	৩ ট্যাবলেট	৩ ট্যাবলেট	৩ ট্যাবলেট	৩ ট্যাবলেট	৩ ট্যাবলেট
>৩৪ (>১৪)	৪ ট্যাবলেট	৪ ট্যাবলেট	৪ ট্যাবলেট	৪ ট্যাবলেট	৪ ট্যাবলেট	৪ ট্যাবলেট

গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাস কো-আর্টেম দিয়ে চিকিৎসা করা যাবে না। ৫ কেজি কম ওজনের শিশুদেরকে কুইনিন দিয়ে চিকিৎসা করতে হবে : ট্যাবলেট কুইনিন ১০ এমজি/কেজি/ডোজ দিনে ৩ বার করে ৭ দিন (মোট ২১ ডোজ দিতে হবে।

মারাত্মক ম্যালেরিয়া (Severe Malaria-SM)

ম্যালেরিয়া উপদ্রুত এলাকায় কোন রোগীর গত ৪৮ ঘন্টার বেশী জ্বর অথবা জ্বরের ইতিহাসের সাথে নিম্নে উল্লেখিত লক্ষণ সমূহের যে কোন এক বা একাধিক লক্ষণ উপস্থিত থাকলে তাকে মারাত্মক ম্যালেরিয়া বলে সনাক্ত করতে হবে।

- রোগী অস্বাভাবিক আচরণ করছে বা অজ্ঞান অথবা খিচুনি হচ্ছে
- দাড়াঁতে ও হাঁটতে পারছে না
- বমি হচ্ছে
- মুখে খেতে পারছে না
- মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় ভুগছে
- শরীরের যে কোন স্থান থেকে রক্ত ক্ষরণ হচ্ছে
- শ্বাসকষ্ট আছে
- প্রস্রাবের পরিমান খুব কমে যাওয়া (রেনাল ফেলিউর এর লক্ষণ)

এই সকল রোগীকে জরুরী ভিত্তিতে হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পাঠাতে হবে।

ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া

কোন রোগীর গত ৪৮ ঘন্টার মধ্যে জ্বর বা জ্বরের ইতিহাস থাকলে এবং জ্বরের অন্য কোন গ্রহণযোগ্য কারণ না থাকলে, ম্যালেরিয়া হিসাবে ধারণা করা যেতে পারে। রোগীর Blood Slide Examination (BSE) বা Rapid Diagnostic Test (RDT) ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার জন্য পজিটিভ হলে ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া হিসাবে সনাক্ত করতে হবে ও চার্ট অনুযায়ী চিকিৎসা করতে হবে।

চিকিৎসার চার্ট

দিন	ঔষধ	ওজন (কেজি)						
		৩-৫	৬-৯	১০-১৯	২০-২৯	৩০-৩৯	৪০-৪৯	৫০ +
১ম	ক্লোরোকুইন টেব: ১৫০ মিঃ গ্রাঃ	০	১/২	১	১/২	২	৩	৪
২য়	ক্লোরোকুইন টেবঃ ১৫০ মিঃ গ্রাঃ	০	১/২	১	১/২	২	৩	৩
৩য়	ক্লোরোকুইন টেবঃ ১৫০ মিঃ গ্রাঃ	০	১/২	১	১/২	২	২	৩
৪র্থ	প্রিমাকুইন টেবঃ ১৫ঃ গ্রাঃ	০	১/২	১/২	১	২	৩	৩
প্রিমাকুইনঃ সর্বমোট ১৪দিন প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য ১৫ মিঃ গ্রাঃ/দিন * শিশুদের ক্ষেত্রে ০.৩ মিঃ গ্রাঃ/কেজি/প্রতিদিন								

ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ঃ

ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর আওতায় ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের উল্লেখযোগ্য ব্যবস্থাগুলি হচ্ছে

- দ্রুত রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা প্রদান।
- মশার কামড় হতে আত্মরক্ষা করা।
- এলাকাতে মশার জন্ম ও বংশ বিস্তার রোধ করা।
- দ্রুত মহামারী চিহ্নিত করে তা নিয়ন্ত্রণ করা।

মশার কামড় হতে আত্মরক্ষার উপায়গুলি হচ্ছে -

- ঘুমানোর সময় মশারী (বিশেষ করে কীটনাশকযুক্ত বা কীটনাশকে চুবানো) ব্যবহার করা।
- মশা তাড়াবার ধোঁয়া (যেমন মশার কয়েল, ধোঁয়া) ইত্যাদি ব্যবহার করা।
- যতটুকু সম্ভব শরীর ঢেকে রাখা (ফুল হাতা শার্ট/জামা পরিধাণ ইত্যাদি।

- সম্ভব হলে শোবার ঘরে দরজা জানালায় Mosquito Proof Net ব্যবহার করা।

পাঠ-৬

বার্ড ফ্লু (Bird Flu/Avian Influenza)

বার্ড ফ্লু

বার্ড ফ্লু (এভিয়ান-ইনফ্লুয়েঞ্জা) একটি ভাইরাসজনিত ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগটি সাধারণত শুরু হয় জ্বর-সর্দি কাশির মাধ্যমে এবং পরে তা মারাত্মক নিউমোনিয়ার রূপ ধারণ করে যার পরিণতি হচ্ছে মৃত্যু।

বার্ড ফ্লুর কারণঃ

মানুষের ইনফ্লুয়েঞ্জাকে আমরা ফ্লু বলি, পাখিদের তেমনি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে থাকে, যাকে বার্ড ফ্লু বলা হয় যার টেকনিক্যাল নাম এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা। এর জীবাণু বার্ড ফ্লু আক্রান্ত হাঁস মুরগী বা অন্যান্য পাখির মল, রক্ত বা শ্বাসনালীতে বাস করে। মানুষ ঘটনা-চক্রে রোগে আক্রান্ত হয়। প্রাপ্ত বয়স্কদের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সংক্রমণই ঘটেছে তাদের, যারা আক্রান্ত পাখি জবাই/পালক ছাড়ানোর জন্য নাড়াচড়া করেছে। আবার যে সমস্ত শিশু আক্রান্ত পাখি বা মৃত হাঁস-মুরগী নিয়ে খেলা করে তাদেরও এ রোগ হতে পারে। বার্ড ফ্লুর জীবাণুর অনেকগুলো সাব-টাইপ করা হয়েছে যেমন- (H1 N1), (H5 N1)। এই ভাইরাস শীতকালীন পাখি বন্য হাঁসের মাধ্যমে আমাদের দেশে আসে, সেখান থেকে গৃহপালিত হাঁস ও পরবর্তীতে গৃহপালিত মোরগ-মুরগীতে এই ভাইরাস বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে H5 N1 ভাইরাসটি বেশী মারাত্মক।

এই রোগের ভয়াবহতাঃ

বিশ্বব্যাপি ইনফ্লুয়েঞ্জা এ ভাইরাসের তিনটি মহামারী সংঘটিত হয়েছে। ১৯১৮-১৯ সালে যা স্প্যানিশ ফ্লু নামে পরিচিত ছিল, তখন বিশ্বের প্রায় ৪ কোটি মানুষ মারা যায়। ১৯৫৭-৫৮ সালে যা এশিয়ান ফ্লু নামে পরিচিত এবং মারা যায় ১০-১২ লাখ মানুষ। ১৯৬৮-৬৯ সালে সংগঠিত হয় ৩য় মহামারী, যা হংকং ফ্লু নামে পরিচিত, মারা যায় প্রায় ৭ লাখ মানুষ।

এই শতকের শুরুতে ২০০৩ সালে, চীনে সর্বপ্রথম বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। পরে এটা কোরিয়া, ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ায় ছড়ায়। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সরকারীভাবে বার্ড ফ্লুর প্রাদুর্ভাব

ঘোষিত হয় ফেব্রুয়ারী/২০০৭ সালে। জানুয়ারী/২০০৮ সালে এই রোগের প্রার্দুভাব দেখা যায়। তখন ২৯ জেলায় ৪৮টি উপজেলাকে ঝুকিপূর্ণ ঘোষনা করা হয়েছিল।

কিভাবে সংক্রমিত হয়?

- বার্ড ফ্লু আক্রান্ত অথবা মৃত পাখির সংস্পর্শে আসলে
- সংক্রমিত হাঁস/ মুরগী/পাখি জবাই ও মাংস প্রস্তুত করলে
- সংক্রমিত হাঁস/ মুরগী/পাখি নমুনা পরীক্ষাগারে পরীক্ষার সময় উপযুক্ত সর্তকতা মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে
- সংক্রমিত হাঁস/ মুরগী/পাখি বিষ্ঠা ও মলের সংস্পর্শে আসলে
- সংক্রমিত হাঁস/ মুরগী/পাখি আবাসস্থলের সংস্পর্শে ৬ সপ্তাহের মধ্যে আসলে
- অল্পসিদ্ধ মাংস বা ডিম খেলে
- অনেক সময় সংক্রমিত পানিতে গোছল বা পানি খেলে

লক্ষণ বা উপসর্গঃ

বার্ড ফ্লু সুনির্দিষ্ট কোন লক্ষণ নেই তবে প্রাথমিকভাবে নিম্নলিখিত উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন-

- জ্বর
- গা ব্যথা, কাশি,সর্দি
- মাথা ব্যথা, শরীর ব্যথা।

তবে চুড়ান্ত পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত মারাত্মক উপসর্গ দেখা দিতে পারে-

- শ্বাসকষ্ট
- নিউমোনিয়া
- একিউট রেসপিরেটরী ডিসট্রেস সিনড্রোম (Acute Respiratory distress syndrome)
- এনকেফালাইটিস (Encephalitis)
- একাধিক অঙ্গের অকার্যকারিতা (Multi-organ Failure)

চিকিৎসা ঃ

- রোগী সব সময় মাস্ক পরে থাকবেন।
- পরিবারের একজন নির্দ্দিষ্ট লোক রোগীর সেবা করবেন এবং তিনিও সেবা প্রদানের সময় মাস্ক ব্যবহার করবেন।
- রোগীর সেবা প্রদানের পর কিংবা রোগীর ব্যবহার করা জিনিষপত্র নাড়া চাড়া করার পর সাবান দিয়ে দু'হাত ধোবেন।

- রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র/কাপড়/বিছানার চাদর সাবান পানিতে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর ধুয়ে ফেলবেন।
- রোগী মোট ১০ দিন পর্যন্ত বাড়ীতে অবস্থান করবেন বা বিশ্রাম নিবেন।
- মানুষের ভিড় আছে এ রকম জায়গাতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন।
- রোগী বা বাড়ীর কেউ শ্বাস কষ্ট জনিত বা অন্য কোন কারণে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে, তিন দিনের মধ্যে ও জ্বর না কমলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।
- রোগী বেশী করে পানি পান করবেন।
- সাধারণতঃ উপসর্গ ভিত্তিক ঔষধ দেয়া যায়, যেমন- জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল।
- ওসেলটামিভির নামক ঔষধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয় যা শুধুমাত্র একজন ডাক্তার দিতে পারেন।

প্রতিরোধ ঃ

- রোগে আক্রান্ত হাঁস-মুরগী জবাই করা বা পালক ছড়ানো যাবে না।
- খালি হাতে অসুস্থ বা মৃত হাঁস-মুরগী বা অন্যান্য পাখি ধরা ছোয়া ও নাড়াচাড়া করা যাবে না।
- মৃত হাঁস-মুরগী বা পাখি মাটিতে গর্ত করে পুঁতে ফেলতে হবে।
- হাঁস-মুরগী বা অন্যান্য পাখি ধরা ছোয়া ও সেগুলো নিয়ে খেলাধুলা করা থেকে শিশুদের বিরত রাখতে হবে।
- হাঁস-মুরগী বা পশুপাখি ধরা ছোয়ার পর সাবান দিয়ে কমপক্ষে ২০ সেকেন্ড আংগুলের ফাঁকসহ কবজি পর্যন্ত ভাল করে দুই হাত পরিস্কার করে ধুতে হবে।
- হাঁস-মুরগী বা পশু পাখির কাছে যেতে হলে সব সময় কাপড় দিয়ে নাক-মুখ ঢেকে নিতে হবে। হাঁস-মুরগী ধরার পর সেই হাত না ধুয়ে চোখ, নাক বা মুখে লাগানো যাবে না।
- হাঁস-মুরগীর মাংস ভাল করে সিদ্ধ করে রান্না করতে হবে। ডিম পুরোপুরি সিদ্ধ বা দুপিঠ ভালো করে ভেজে খেতে হবে।
- বার্ডফ্লু আক্রান্ত এলাকায় হাঁস-মুরগী কেনা বেচা ও হাঁস মুরগীর বাজার বন্ধ রাখতে হবে।
- হাঁস-মুরগী বা অন্যান্য পাখির মল জীবাণুমুক্ত না করে সার অথবা মাছের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না।
- যদি কোথাও হাঁস-মুরগী বা অন্যান্য পাখির মড়ক দেখা দেয়, তবে নিকটস্থ স্বাস্থ্যকর্মী, ইউ,পি,সদস্য ওয়ার্ড কমিশনার অথবা থানা পশু হাসপাতালে জানাতে হবে।
- হাঁস-মুরগী বা অন্যান্য পাখি ধরা ছোয়ার পর যদি কেউ সর্দি, কাশি জ্বরে আক্রান্ত হন তাকে অবশ্যই তাড়াতাড়ি ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে।
- হাঁচি, কাশি, কফ ও থুথু এ রোগসহ অন্যান্য রেগের জীবাণু ছড়ায়। তাই যেখানে সেখানে কফ, থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকতে হবে ।

পাঠ-৭
সোয়াইন ফ্লু(H1N1 Pandemic Flu)

সোয়াইন ফ্লু

সোয়াইন ফ্লু এক ধরনের ভাইরাসজনিত শ্বাসতন্ত্রের রোগ যা সাধারণত শুকর হতে মানুষে এবং পরবর্তীতে মানুষ হতে মানুষে ছড়ায়।

সোয়াইনফ্লু-এর বিশ্ব পরিস্থিতি

সর্ব প্রথম ১৯১৮ সালে মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ইতিহাস পাওয়া যায়। সর্বশেষ এপ্রিল ২০০৯ সোয়াইন ফ্লুর মহামারী হয়। ফেব্রুয়ারী ২০১০ সালে পর্যন্ত পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ল্যারেটরী পরীক্ষার মাধ্যমে সোয়াইন ফ্লু রোগী সনাক্ত করা হয়েছে, যাদের মধ্যে ১৬,২২৬ জন মারা গেছেন। তবেবিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০১০ সালে এ রোগটির বিশ্ব মহামারী বা প্যানডেমিকেরসমাপ্তি ঘোষনা করেছে।

কারণ ঃ

ইনফ্লুয়েঞ্জা-এ ভাইরাসের এইচ১ এন১ সাবটাইপ দিয়ে সাধারণত এ রোগ হয়ে থাকে।

যেভাবে ছড়ায় ঃ

- হাঁচি কাশির মাধ্যমে
- রোগীর সর্দি কাশি লেগে থাকা কোন জিনিস স্পর্শ করলে।

উপসর্গ ও লক্ষণ ঃ

- এ রোগের লক্ষণ ও উপসর্গ সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা বা ফ্লু এর মতই। ২ সপ্তাহের মধ্যে ফ্লু-তে আক্রান্ত হওয়া রোগীর সংস্পর্শে আসার ইতিহাস থাকতে পারে।
- উপসর্গ ও লক্ষণগুলো হচ্ছে-জ্বর, সর্দি, হাঁচি কাশি, গলা ব্যথা, গা ব্যথা

জটিলতা ঃ

- বমি
- পাতলা পায়খানা
- শ্বাস কষ্ট

রোগ নির্ণয় ঃ

রক্তে এইচ১ এন১ ভাইরাসের উপস্থিতি সনাক্ত করনের মাধ্যমে।

চিকিৎসা ঃ

- ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগী সব সময় মাস্ক পরে থাকবেন।
- পরিবারের একজন নির্দ্দিষ্ট লোক রোগীর সেবা করবেন এবং তিনিও সেবা প্রদানের সময় মাস্ক ব্যবহার করবেন।

- রোগীর সেবা প্রদানের পর কিংবা রোগীর ব্যবহার করা জিনিষপত্র নাড়া চাড়া করার পর সাবান দিয়ে দু'হাত ধোবেন।
- রোগীর ব্যবহৃত জিনিষপত্র/কাপড়/বিছানার চাদর সাবান পানিতে ৩০ মিনিট ভিজিয়ে রাখার পর ধুয়ে ফেলবেন।
- রোগী মোট ১০ দিন পর্যন্ত বাড়ীতে অবস্থান করবেন বা বিশ্রাম নিবেন।
- মানুষের ভিড় আছে এ রকম জায়গাতে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন।
- রোগী বা বাড়ীর কেউ শ্বাস কষ্ট জনিত বা অন্য কোন কারণে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে, তিন দিনের মধ্যে ও জ্বর না কমলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন।
- রোগী বেশী করে পানি পান করবেন।
- সাধারণতঃ উপসর্গ ভিত্তিক ঔষধ দেয়া যায়, যেমন- জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল।
- ওসেলটামিভির নামক ঔষধ দিয়ে এ রোগের চিকিৎসা করা হয় যা শুধুমাত্র একজন ডাক্তার দিতে পারেন।

প্রতিরোধ ঃ

- হাঁচি-কাশির সময় নাক মুখ ঢেকে নিতে হবে।
- হাঁচি-কাশি দেয়ার সময় পরিস্কার রুমাল গামছা কাপড় বা টিস্যু পেপার ব্যবহার করতে হবে।
- ব্যবহৃত রুমাল, গামছা ও কাপড় ভাল করে সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- ব্যবহৃত টিস্যু পেপার যেখানে সেখানে না ফেলে ময়লা ফেলার নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে।
- রুমাল গামছা কাপড় বা টিস্যু পেপার না থাকলে জামার হাতা/ শাড়ীর আচঁল দিয়ে নাক মুখ ঢাকতে হবে এবং ঘরে ফিরে ঐ জামা কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে।
- নিয়মিত সাবান পানি দিয়ে দু'হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।
- যেখানে সেখানে কফ বা থুথু ফেলবেন না। জ্বর সর্দি কাশি হলে অন্যের সংস্পর্শে এড়িয়ে চলুন এবং যতটা সম্ভব বাড়ীতে থাকতে হবে।
- তিন দিনের মধ্যে জ্বর না কমলে এবং জ্বরের সাথে শ্বাস কষ্ট দেখা দিলে এবং গুরুতর অসুস্থ হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।
- দিনে কয়েকবার সাবান দিয়ে দু'হাত ভাল করে ধুয়ে নিতে হবে।

পাঠ-৮
চিকুনগুনিয়া (Chikungunya)

ভূমিকা

চিকুনগুনিয়া একটি ভাইরাস জনিত জ্বর যা আক্রান্ত মশার কামড়ের মাধ্যমে মানুষ থেকে মানুষে ছড়ায়। এ রোগটি ডেঙ্গু, জিকা এর মতই এডিস প্রজাতির মশার কামড়ের মাধ্যমে ছড়ায়। রোগটি প্রথম ১৯৫২ সালে আফ্রিকাতে দেখা যায়। পরবর্তীতে এশিয়ার বিভিন্ন দেশ যেমন-ভারত, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মায়ানমার এবং ইন্দোনেশিয়াতে এর বিস্তার দেখা যায়। বাংলাদেশে প্রথম ২০০৮ সালে রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জে প্রথম এ ভাইরাসের প্রার্দুভাব দেখা যায়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে ঢাকার দোহার উপজেলায় এই রোগ দেখা যায়। তবে এর পরে বিচ্ছিন্ন দু একটি রোগী ছাড়া এ রোগের বড় ধরণের কোন বিস্তার আর বাংলাদেশে লক্ষ্য করা যায়নি। বর্ষার পর পর যখন মশার উপদ্রব বেশী হয় তখন এ রোগের বিস্তার বেশী দেখা যায়।

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস কি ?

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস টোগা ভাইরাস গোত্রের ভাইরাস। মশাবাহিত হওয়ার কারণে একে আরবো ভাইরাসও বলে। ডেঙ্গু ও জিকা ভাইরাস ও একই মশার মাধ্যমে ছড়ায় এবং প্রায় একই রকম রোগের লক্ষণ লক্ষ্য করা যায়।

রোগের লক্ষণ সমূহ

(১) হঠাৎ জ্বর আসা সঙ্গে প্রচন্ড গিটে গিটে ব্যথা।

(২) অন্যান্য লক্ষণ সমুহের মধ্যে-

- প্রচন্ড মাথাব্যথা
- শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি (Chill)
- বমি বমি ভাব অথবা বমি
- চামড়ায় লালচে দানা (Skin Rash)
- মাংসপেশীতে ব্যথা (Muscle Pain)

সাধারণতঃ রোগটি এমনি এমনিই সেরে যায়, তবে কখনো কখনো গিটের ব্যথা কয়েক মাস এমনকি কয়েক বছরের বেশী সময় থাকতে পারে।

বাহক

এডিস ইজিপ্টি (Aedes aegypti) এবং এডিস এলবোপিকটাস (Aedes albopictus) মশার মাধ্যমে এ রোগ ছড়ায়। মশাগুলি সহজেই এদের শরীরের ও পায়ের সাদা কালো ডোরাকাটা দাগ দেখে চেনা যায়।

কারা ঝুঁকির মুখে

এ মশাগুলি সাধারণতঃ পরিষ্কার বদ্ধ পানিতে জন্মায় এবং যাদের আশে পাশে এ রকম মশা বৃদ্ধির জায়গা আছে, সে সব মানুষেরা বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

কিভাবে ছড়ায়

প্রাথমিকভাবে চিকুনগুনিয়া ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত এডিস ঈজিপ্টাই অথবা এডিস অ্যালবুপিক্টাস মশার কামড়ের মাধ্যমেছড়ায়। এ ধরণের মশা সাধারণত দিনের বেলা (ভোর বেলা অথবা সন্ধ্যার সময়) কামড়ায়। এছাড়াও চিকুনগুনিয়া ভাইরাস আক্রান্ত রক্তদাতার রক্ত গ্রহণ করলে এবং ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষার সময় অসাবধানতাবশতঃ এ রোগ ছড়াতে পারে।

সুপ্তিকাল

৩-৭ দিন (তবে ২-২১ পর্যন্ত হতে পারে)।

প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ

এ রোগ প্রতিরোধের কোন টিকা নাই। ব্যক্তিগত সচেতনতাই চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধের প্রধান উপায়।

- *মশার কামড় থেকে সুরক্ষা ঃ* মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচার সবচেয়ে ভালো উপায়। শরীরের বেশীর ভাগ অংশ ঢেকে রাখা (ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরা), জানালায় নেট লাগানো, প্রয়োজন ছাড়া দরজা জানালা খোলা না রাখা, ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করা, শরীরে মশা প্রতিরোধক ক্রীম ব্যবহার করার মাধ্যমে মশার কামড় থেকে বাঁচা যায়। শিশু, অসুস্থ রোগী এবং বয়স্কদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।

- *মশার জন্মস্থান ধ্বংস করা ঃ* আবাসস্থল ও এর আশে পাশে মশার প্রজনন ক্ষেত্র ধ্বংস করতে হবে। বাসার আশেপাশে ফেলানো মাটির পাত্র, কলসী, বালতি, ড্রাম, ডাবের খোলা ইত্যাদি যে সকল স্থানে পানি জমতে পারে, সেখানে এডিস মশা প্রজনন করতে পারে। এসব স্থানে যেন পানি জমতে না পারে

সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা এবং নিয়মিত বাড়ির আশে পাশে পরিষ্কার করা। সরকারের মশা নিধন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করা । যেহেতু এ মশা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত থেকে জীবাণু নিয়ে অন্য মানুষকে আক্রান্ত করে, কাজেই আক্রান্ত ব্যক্তিকে যাতে মশা কামড়াতে না পারে সে ব্যাপারে ব্যবস্থা নেওয়া ।

রোগ নির্ণয়

উপরোল্লিখিত উপসর্গ সমূহ দেখা দিলে, উক্ত ব্যক্তির চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের আশংকা থাকে। উপসর্গ সমূহ শুরুর এক সপ্তাহের মধ্যে চিকুনগুনিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তে ভাইরাসটি (Serology Ges RT-PCR) পরীক্ষার মাধ্যমে সনাক্ত করা যায়। বাংলাদেশ সরকারের রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিটিউট (আইইডিসিআর)-এ চিকুনগুনিয়া রোগ নির্ণয়ের সকল পরীক্ষা করা হয়।

চিকিৎসা

চিকুনগুনিয়া ভাইরাস সংক্রমণের চিকিৎসা মূলত উপসর্গ ভিত্তিক। এর কোনো সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা নেই। আক্রান্ত ব্যক্তিকে বিশ্রাম নিতে হবে, প্রচুর পানি ও তরল জাতীয় খাবার খেতে হবে এবং প্রয়োজনে জ্বর ও ব্যথার জন্য Paracetamol Tablet এবং চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খেতে হবে। তবে গিটের ব্যথার জন্য গিটের উপরে ঠান্ডা পানির শেক এবং হালকা ব্যায়াম উপকারী হতে পারে। তবে প্রাথমিক উপসর্গ ভালো হওয়ার পর যদি গিটের ব্যথা ভালো না হয়, তবে অতিসত্বর চিকিৎসকের পরামর্শ মোতাবেক ঔষধ খেতে হবে। কোন কারণে রোগীর অবস্থার অবনতি হলে অতি শীঘ্র নিকটস্থ সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করতে হবে।

রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইআডিসিআর), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

অধ্যায় ২ ঃ অসংক্রামক রোগসমুহ

পাঠ-১
উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ

মানুষের শরীরের স্বাভাবিক রক্তচাপ হচ্ছে ১২০/৮০ মিঃ মিঃ মার্কারী, তবে বয়স ভেদে তার পরিবর্তন ঘটে। যখন অনুর্ধ ২০ বৎসরের কোন ব্যক্তির রক্তচাপ ১৪০/৯০ মিঃ মিঃ মার্কারী ও অনুর্ধ ৫০ বৎসরের কোন ব্যক্তির রক্তচাপ ১৬০/১০০ মিঃ মিঃ মার্কারী বেশী হয় তখন তাকে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। এই অবস্থায় রোগীাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠাতে হবে।

মানুষের দৈহিক ও মানসিক কাজ কর্মের সাথে রক্তচাপ এর পরিবর্তন হয়। তবে পূর্ণ বিশ্রামের পর তা আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসে। তাই সব সময় বিশ্রামের পরেই রক্তচাপ মাপা উচিৎ।

রক্তচাপের কারণ ঃ

পঁচানব্বই ভাগ এর বেশি রোগীর ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের নির্দিষ্ট কোন কারণ পাওয়া যায় না। সে সকল রোগী 'এসেনসিয়াল হাইপারটেনসন' এ আক্রান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। এদের মধ্যে ৭০ ভাগের ক্ষেত্রে পরিবারের অন্য একজন উচ্চ রক্তচাপে ভোগে এবং বংশগত ইতিহাস থাকে। শতকরা ৫ ভাগের ক্ষেত্রে উচ্চ রক্তচাপের কারণ পাওয়া যায়। সেগুলো হলো:

- কিডনির বিভিন্ন রোগ যেমন কিডনির প্রদাহ, কিডনিতে পাথর, কিডনির ক্যান্সার ও কিডনির ধমনীর অস্বাভাবিকতা
- শরীরে বিশেষ বিশেষ হরমোনের পরিমাণ বেড়ে গেলে
- কিছু ঔষধ দীর্ঘদিন ধরে খাবার ফলে যেমন-

- জন্মনিরোধক বড়ি (ইস্ট্রোজেন সমৃদ্ধ)
- করটিকোস্টেরয়েড (ডেকাসন, অরাডেকসন, ডেক্সামিথাসন ইত্যাদি)
- বাতের ঔষধ (ইনফ্লাম, ইনডোমেথাসিন ইত্যাদি)

- গর্ভাবস্থায় প্রি-একলাম্পশিয়া দেখা দিলে

লক্ষণ ও উপসর্গ

উচ্চ রক্তচাপ মূলত একটি উপসর্গ বিহীন রোগ। হৃৎপিন্ড নীরবে বহু দিন ধরে এ রোগের ধকল সামলে চললেও রোগী কিছু বুঝতে পারে না। মজার বিষয় হচ্ছে কোন সুস্থ স্বাভাবিক লোককেও যদি বলে দেওয়া হয় যে তাঁর উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে তাহলে তিনি কিছুদিনের মধ্যেই কতগুলো উপসর্গ নিয়ে চিকিৎসকের কাছে হাজির হন যেমন মাথা ঘুরা, ঘাড়ে ব্যথা, ঘাড়ের শিরা দপদপ করা ইত্যাদি। আবার একজন

সত্যিকারের উচ্চ রক্তচাপের রোগীকে যদি বলা হয় যে তার রক্তচাপ স্বাভাবিক রয়েছে। তাহলে তিনি খুব বেশি অসুবিধার কথা বলেন না, দিব্যি ঘুরে ফিরে বেড়ান।

জটিলতা ঃ

উপসর্গবিহীন এই অবস্থায় উচ্চ রক্তচাপ নীরবে শরীরের ক্ষতি সাধন করে চলে। চিকিৎসক অন্য রোগের জন্য আগত রোগীর রক্তচাপ পরীক্ষা করতে গিয়ে এই রোগ সনাক্ত করেন। অথবা হঠাৎ করে জটিলতা নিয়ে এ রোগটি আত্মপ্রকাশ করে। এ সময় রোগী নানা উপসর্গের কথা বলতে পারে। যেমন-

- **শ্বাসকষ্ট ঃ** প্রথম দিকে হাঁটা চলা করার ফলে শ্বাসকষ্ট হয়। পরে ঘরে বসে থাকা অবস্থায় শ্বাসকষ্ট হতে পারে। মাঝ রাতে শ্বাসকষ্টের দরুণ রোগীর ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং রোগী উঠে বসলে এর কিছুটা উপশম হয়।
- **হৃদপিন্ডের কার্যহীণতা (হার্ট ফেইলিওর)**
- **বুকে ব্যথা :** হৃদপিন্ডের করোনারি ধমনীতে রক্ত চলাচল ব্যাহত হলে বুকে ব্যথা হয়।
- **পক্ষাঘাত (স্ট্রোক) :** মস্তিস্কে রক্ত চলাচল বিঘ্ন হলে কিংবা রক্তনালী ছিঁড়ে গেলে পক্ষাঘাত বা স্ট্রোক হয়।
- **কিডনির রোগ বা বিকলতা:** প্রস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়া, শরীরে পানি আসা, অস্বাভাবিক দূর্বলতা বোধ করা, রক্তস্বল্পতা বা শরীর ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া, বমিবমি ভাব হওয়া।
- **দৃষ্টিশক্তির অস্পষ্টতা :** চোখের রেটিনা ক্ষতিগ্রস্থ হলে চোখে দেখতে অসুবিধা হয়।
- **খিচুনি :** মারাত্মক (ম্যালিগন্যান্ট) উচ্চ রক্তচাপের (২২০/১৩০মিঃ মিঃ মার্কারী) ফলে রোগীর হঠাৎ করে

খিচুনি শুরু হতে পারে, দৃষ্টিশক্তি কমে যেতে পারে এবং সর্বোপরি অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে।

শারীরিক পরীক্ষা

রক্তচাপ পরীক্ষা করা হলো প্রধান শারীরিক পরীক্ষা। রোগী কক্ষে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই রোগীর রক্তচাপ পরীক্ষা করা উচিত নয়। ৫-১০ মিনিট বিশ্রাম নেওয়ার পর রক্তচাপ পরিমাপ করা উচিত। দূভাবে রক্তচাপ পরিমাপ করা উচিত-বসা অবস্থায় এবং শোয়ানো অবস্থায় (কনুইয়ের অর্ধেক ইঞ্চি অথবা এক ইঞ্চি ওপরে রক্তচাপ মাপার যন্ত্রের কাফটি বাধতে হয় এবং ঠিক কনুইয়ের ভাঁজের ওপরে স্টেথোস্কোপ রেখে রক্তচাপ মাপা উচিত) প্রথম বার রোগীর রক্তচাপ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি পাওয়া গেলে রক্তচাপ কিছুক্ষণ পর (১০ মিনিট) আবার মাপতে হবে।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

- প্রস্রাব পরীক্ষা : এলবুমিন, সুগার
- বুকের এক্স-রে

- ইসিজি
- রক্তের গ্লুকোজ
- রক্তের ইউরিয়া
- রক্তের ক্রিয়েটিনিন
- লিপিড প্রোফাইল

চিকিৎসা

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য কোন শারীরিক অসুবিধা দূর করা নয়। চিকিৎসা করার মূল লক্ষ্য হচ্ছে এর জটিলতাগুলো প্রতিরোধ করা। যে সব রোগ একবার হলে সারা জীবন ধরে মানুষকে ভোগায়, উচ্চ রক্তচাপ তার মধ্যে অন্যতম। একবার কারো উচ্চ রক্তচাপ হলে সারা জীবন তাকে উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখার ব্যবস্থা নিতে হবে। চিকিৎসার ফলে এটা নিরাময় হয় না, কিন্তু নিয়ন্ত্রণে থাকে। শুধু উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসা করা নয় পুরো মানুষটিকে চিকিৎসা করাটাই মূখ্য। উচ্চ রক্তচাপ চিকিৎসা করার কয়েকটি ধাপ আছে।

ক) সাধারণ ব্যবস্থাপনা :

উচ্চ রক্তচাপ : নিয়ন্ত্রণের জন্য সাধারণ ব্যবস্থাপনা

- বিশ্রাম - কাজের ফাঁকে ফাঁকে উপযুক্ত বিশ্রাম নিতে হবে।
- ধুমপান - ধূমপান বন্ধ করা, তামাকজাতীয় দ্রব্যাদি বর্জন করা।
- খাদ্য- মোটা ও অতিরিক্ত ওজনের রোগীদের ওজন কমানো -স্বাভাবিক সব খাবার খাবে, শাক-সবজি খাবে- মদ্যপান বন্ধ করা/নিষিদ্ধ করা- অতিরিক্ত লবণ (পাতে লবন) খাওয়া নিষেধ।
- চর্বি জাতীয় খাবার কমানো।
- ব্যয়াম- নিয়মিত হালকা ব্যায়াম এবং হাঁটাহাঁটি করা।
- ডায়াবেটিস বা অন্য রোগ থাকলে খাবারের ধরণ সেই অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হবে।

খ) উচ্চ রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণকারী ঔষধের ব্যবহার :

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় রক্তচাপের তারতম্যের (ওঠা নামার) ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন ধরনের ঔষধ বিভিন্ন মাত্রায় দেয়া হয়। ১৪০ সিস্টোলিক এবং ৯০ ডায়াস্টোলিক (মিঃমিঃ মার্কারী) বেশী হলে উচ্চ রক্তচাপ বলা হয়। তবে রক্তচাপ ১৩০/৮৫ (মিঃমিঃ মার্কারী) এর নীচে রাখা বাঞ্ছনীয়।

মৃদু উচ্চ রক্তচাপের ব্যবস্থাপনা :

- পরিমাণ মত বিশ্রাম নিতে হবে
- দুশ্চিন্তা এড়িয়ে থাকার পরামর্শ দিতে হবে।
- ধুমপান ও তামাকজাতীয় দ্রব্যাদি ছেড়ে দিতে হবে।

- নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করাতে হবে।
- ১৫-৩০ দিনের মধ্যে আবার রক্তচাপ পরীক্ষা করাতে হবে।

পরামর্শ ও প্রতিরোধ

চিকিৎসা ব্যবস্থাপনায় উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের ক্ষেত্রে কিছু পরামর্শ দেয়া হয়ে থাকে। এছাড়াও রোগীদের কিছু নিয়ম অবশ্যই মেনে চলতে হয়। যেমন-

- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়মিত অনুসরণ করা।
- চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া ঔষধ বন্ধ না করা বা না বদলানো।
- কোন প্রকার জটিলতা দেখা দিলেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়া।
- যে সকল পরিবারের উচ্চ রক্তচাপের বংশগত ইতিহাস আছে অথবা পরিবারের কোন সদস্য উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত আছে সেসব ক্ষেত্রে অন্য সদস্যদের নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করা।
- ধূমপান, মদ্যপান, অতিরিক্ত লবণ খাওয়া অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা।

পাঠ-২
ডায়াবেটিস

ডায়াবেটিস হচ্ছে একটি রোগ যা পঞ্চাশ ভাগেরও বেশি ক্ষেত্রে নির্ণয়হীন অবস্থায় (Undiagnosed) থেকে যায়। দশ থেকে বিশ ভাগ রোগী চিকিৎসকের কাছে প্রথমেই মারাত্মক জটিলতা নিয়ে উপস্থিত হয়। অথচ খুবই সহজ এক পরীক্ষার (মূত্রে শর্করা নির্ণয়) দ্বারা এ রোগ ধরা সম্ভব। এ রোগ যত তাড়াতাড়ি নির্ণয় করা যাবে তত তার চিকিৎসা সহজ হবে এবং রোগী এর বহুমাত্রিক জটিলতা থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এ জন্যেই রোগীর লক্ষণ বা উপসর্গ এবং এর সহজ রোগ নির্ণয় পদ্ধতি সম্বন্ধে যদি প্রাথমিক জ্ঞান থাকে তবে আমরা জনগোষ্ঠীর এক বিরাট অংশকে এ রোগের ভয়াবহতা থেকে সহজেই রক্ষা করতে পারি।

ডায়াবেটিস কি ও কেন হয়?

ডায়াবেটিস রোগটি খুবই জটিল শারীরিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়। সহজ ভাষায় ডায়াবেটিস হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যেখানে শরীরের রক্তের মধ্যে শর্করা বা চিনির পরিমাণ স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রায় থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় রক্তে শর্করা বা চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত থাকে। ইনসুলিন নামে এক ধরনের হরমোন (এক ধরনের রস যা অগ্নাশয় গ্রন্থিথেকে উৎপন্ন হয়) রক্তে চিনির মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখে। ডায়াবেটিস হলে শরীরে যে ইনসুলিন উৎপন্ন হয় তা শরীরের প্রয়োজন মেটাতে পারে না এবং রক্তে চিনির পরিমাণ বেশি মাত্রায় থেকে যায়। এর ফলে প্রস্রাবের মধ্যে চিনি বা শর্করা দেখা দেয়।

ডায়াবেটিসকে প্রধানত: চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে-

১. টাইপ-১ ডায়াবেটিস: ইনসুলিন নির্ভরশীল
২. টাইপ-২ ডায়াবেটিস: ইনসুলিন নির্ভরশীল নয় (৯৫%)
৩. গর্ভকালীন ডায়াবেটিস: (Gestational Diabetes- ২% -১০%)
৪. অন্যান্য ডায়াবেটিস (১%-৫%)

কারণ

টাইপ-১ এবং টাইপ-২ ডায়াবেটিস সবচেয়ে বেশি দেখা যায়। সাধারণত টাইপ-১ কম বয়স্ক (৩০ বছরের নীচে) এবং টাইপ-২ বেশি বয়স্ক (৩০ বছরের ওপরে) লোকদের বেলায় দেখা যায়। দুরকমের রোগীর প্রধান পার্থক্যএকটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

বৈশিষ্ট্য	টাইপ-১	টাইপ-২
যে বয়সে দেখা দেয়	<৩০ বছর	> ৩০ বছর
লক্ষণগুলোর স্থায়িত্ব	সপ্তাহ	মাস/বছর
ওজন	স্বাভাবিক বা কম	বেশি
প্রস্রাবে অতিরিক্ত শর্করা	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ইনসুলিন দিয়ে চিকিৎসা না করলে খুব শীঘ্র মৃত্যু	হ্যাঁ	না
রোগ নির্ণয়ের সময় জটিলতা	না	১০-২০%
পারিবারিক ইতিহাস	হ্যাঁ	হ্যাঁ বা না

যদিও সঠিক কোন কারণ এখন পর্যন্ত নির্দিষ্টভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি তবে কিছু কিছু উপাদান (Factors) ডায়াবেটিস রোগের জন্য দায়ী বলে গণ্য করা হয়। যেমন-

১. অত্যাধিক ওজন ও অলস প্রকৃতি

২. বংশগত বিশেষ করে টাইপ-১ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঃ জমজ একজনের ডায়াবেটিস হলে অন্য জনের ৩৬% সম্ভাবনা, মায়ের ডায়াবেটিস হলে ২০% সম্ভাবনা থাকে সন্তানের, বাবার ডায়াবেটিস হলে ৬০% সম্ভাবনা থাকে।

৩. কিছু ভাইরাস যেমন- রোটা ভাইরাস, রুবেলা ভাইরাস

৪. অগ্নাশয়ের রোগ

৫. গর্ভাবস্থা (Gestational Diabetes) - সাধারণত একটু বেশি ওজনের মহিলারা আক্রান্ত হয় বেশি। যাদের গর্ভাবস্থায় ডায়াবেটিস দেখা দেয় তাদের শতকরা ৮০ ভাগ স্থায়ী ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হয়।

৬. সুপ্ত (Latent)- গর্ভাবস্থা প্রদাহ অথবা ওজন বেড়ে যাওয়ার কারণে এদের ডায়াবেটিস হয়।

৭. সম্ভাব্য (Potential)- বংশগত বা পারিবারিক। যাদের নিকট আত্মীয়ের ডায়াবেটিস আছে তাদের মধ্যে ডায়াবেটিস দেখা দিতে পারে।

লক্ষণ ও উপসর্গঃ

একজন ডায়াবেটিস আক্রান্ত রোগী নিচে বর্ণিত লক্ষণসমূহ নিয়ে আসতে পারে-

ক) **লক্ষণবিহীন**- এ সকল রোগীর অন্য কোন কারণে রক্ত ও প্রস্রাব পরীক্ষা করলে প্রস্রাবে মাত্রাতিরিক্ত সুগার বা শর্করা পাওয়া যায়।

খ) টাইপ-১ রোগী

* তীব্র লক্ষণসমূহ যেমন-মারাত্মক পানি ও লবণ স্বল্পতা (ঢিলা চামড়া, শুকনো জিহবা, ফাঁটা ঠোঁট, নিম্ন রক্তচাপ, চোখ বসে যাওয়া, ঘন ও বড় বড় শ্বাস, দ্রুত নাড়ীর গতি, ঘুমঘুম ভাব বা প্রায় অজ্ঞান অবস্থা)

*** সাধারণ লক্ষণসমূহ-**

- বেশি ক্ষুধা লাগা
- পিপাসা পাওয়া ও মুখ শুকিয়ে যাওয়া
- খুব বেশি পরিমাণে প্রস্রাব হওয়া
- ওজন কমে যাওয়া
- দূর্বল বোধ করা
- চোখের দৃষ্টি অস্পষ্ট হওয়া

*** জটিলতাসহ**

(ঘ) টাইপ-২ রোগী

- সাধারণ লক্ষণসমূহ

- জটিলতাসহ

(ঘ) **সম্ভাব্য ডায়াবেটিস-** যাদের পরিবারের কোন সদস্য ডায়াবেটিস এ আক্রান্ত তারা লক্ষণবিহীন অবস্থায় অথবা সাধারণ লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে।

(ঙ) **সুপ্ত ডায়াবেটিস-** গর্ভাবস্থায় মানসিক ও শারীরিক অত্যাধিক চাপের মুখে, কোন ঔষধ (পূর্বে উল্লেখিত) খাওয়ার সময় ডায়াবেটিস লক্ষণ নিয়ে আসতে পারে।

জটিলতা ঃ

শরীরের যে কোন অংশেই ডায়াবেটিসের বহুমাত্রিক জটিলতা দেখা দিতে পারে। এখানে সাধারণ কিছু জটিলতার বর্ণনা দেওয়া হলো-

১. কিডনিতে সমস্যা
২. চোখে ছানি পড়া, কম দেখা, অন্ধ হয়ে যাওয়া
৩. ধমনীতে সমস্যা হতে পারে
৪. হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক
৫. চর্ম সমস্যা-ঘা হওয়া এবং তা সহজে ভালো না হওয়া
৬. গর্ভাবস্থায় মৃত বাচ্চা প্রসব, ২৮ দিনের মধ্যে শিশুর মৃত্যু, অপরিণত শিশুর প্রসব, বেশি ওজনের শিশু প্রসব, জন্মগত ত্রুটি নিয়ে শিশুর ভূমিষ্ঠতা, জন্মের সময় আঘাতপ্রাপ্ত (খুব বেশি ওজনের শিশু প্রসবের ফলে)।

ল্যাবরেটরি পরীক্ষা

কিছু পরীক্ষা আছে যা দ্বারা বোঝা যায় রোগী নিশ্চিতভাবে ডায়াবেটিস রোগে আক্রান্ত-

- ৮ ঘন্টা না খেয়ে থাকার পর রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা **১২৬** মিঃগ্রাম (৭ মিঃ মোল) বা তার বেশি।
- বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা অনুমোদিত পরীক্ষা-

উপরি-উক্ত ল্যাবরেটরি পরীক্ষার জন্য শুধু ডাক্তারগণ পরামর্শ দিতে পারবেন।

সময়	রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা (মিঃ মোল)	
	স্বাভাবিক	ডায়াবেটিস
অভূক্ত	<৬.১	>৭
৭৫ গ্রাম গ্লুকোজ খাওয়ার ২ ঘন্টা পর	<৭.৮	>১১.১

- এর সাথে প্রস্রাব করালে প্রস্রাবে গ্লুকোজ পাওয়া যেতে পারে।
- গ্লুকোমিটার ও ষ্ট্রিপের মাধ্যমে তাৎক্ষনি কভাবে রক্তের সুগার নির্ণয় করা যায়।

পরামর্শ ও প্রতিরোধ

- ওজন বেশি থাকলে খাদ্য নিয়ন্ত্রণ, মৃদু ব্যায়াম ও হাটাহাটি করে ওজন কমানো
- চর্বিযুক্ত খাবার কম খাওয়া
- বেশি পরিমাণে আঁশ জাতীয় খাবার গ্রহণ। যেমন-তাজা ফল, শাক-সবজি, সালাদ ইত্যাদি
- রক্ত ও মূত্রে শর্করা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা।

পাঠ-৩
হাঁপানী বা এ্যাজমা

হাঁপানী একটি শ্বাসনালীর প্রদাহজনিত রোগ যাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সময় বায়ু প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি হয় এবং ফলে কাশি, বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, বুকের ভিতরে চাপ বা দমবন্ধ ভাব অনুভুত হয় এবং রোগী ঘন ঘন সংক্ষিপ্ত শ্বাস নেয়। এ রোগে ফুসফুসে বাতাস প্রবেশের পথ সংকুচিত হয় (যা পরিবর্তনশীল) এবং শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে কষ্ট হয় । হঠাৎ করে শ্বাসনালীর সংকোচন হয়ে এ রোগ তীব্র আকার ধারণ করতে পারে। তখন তাৎক্ষনিক চিকিৎসা না দিলে রোগীর খুব কষ্ট হয় এমন কি মারাও যেতে পারেন। এই শ্বাস কষ্ট প্রাথমিক অবস্থায় আপনা-আপনি চলে যায় অথবা ঔষধের মাধ্যমে চলে যায়। শ্বাসকষ্ট অবস্থায় এটা অত্যন্ত কষ্টদায়ক রোগ এবং সঠিক চিকিৎসা না হলে এই রোগ দীর্ঘমেয়াদী ও জটিল আকার ধারণ করে।

কারণ ঃ

হাঁপানীতে আক্রান্ত মানুষের শ্বাসনালীতে সব সময়ই কিছু প্রদাহ থাকতে পারে। এই ক্ষতিগ্রস্থ বিভিন্ন প্রকার সাধারণ উত্তেজক এর প্রতি খুবই স্পর্শকাতর। এটা কোন সংক্রামক ব্যাধি, স্নায়ুবিক ব্যাধি বা মানসিক ব্যাধি নয়, যদিও মানসিক আবেগে ও উৎকন্ঠায় কখনও কিছু কিছু উপসর্গ (কাশি, শ্বাসকষ্ট) দেখা যায়।

উত্তেজকের উপর নির্ভর করে হাঁপানী বা এ্যাজমা সাধারণত নিম্ন ধরণের-

- এ্যালর্জি র কারণে এ্যাজমা
- ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এ্যাজমা
- পেশাগত কারণে এ্যাজমা

- আবহাওয়ার কারণে এ্যাজমা
- ঔষধের কারণে এ্যাজমা
- মানসিক চাপ-এর কারণে এ্যাজমা

লক্ষণ ঃ

১। শ্বাসকষ্ট

- ধূলাবালি বা ঠান্ডা লেগে শ্বাসকষ্ট
- সর্দি লাগার পর শ্বাসকষ্ট
- ব্যথা ও প্রদাহরোধী ঔষধ সেবনে শ্বাসকষ্ট

২। কাশি বিশেষ করে ধুলা বা ঠান্ডা থেকে শুষ্ক কাশি হয়

৩। শ্বাস ফেলার সময় সাঁই সাঁই শব্দ এবং শ্বাস নেয়ার চেয়ে ফেলতে বেশী কষ্ট হয়

৪। হঠাৎ করে বুকের উপর চাপ বা দমবন্ধ ভাব অনুভুত হয়।

হাঁপানী আক্রমণের জন্য দায়ী উত্তেজক বস্তু সমূহঃ

- ধূলা বালি
- ফুলের রেনু
- বসন্তকালে ঘাসে ঢাকা মাঠ
- বালিশের তুলা, পালক, লেপ/কাঁথার আঁশ
- পশুর চুল ও লোম
- কার্পেট
- কাঁচা রঙের গন্ধ
- ধূলাবাহী পোকামাকড়
- ঔষধ
- ঠান্ডা দুধ
- বাদাম
- কোমল পানীয় যেমন; কোকা কোলা ইত্যাদি
- ঠান্ডা শুষ্ক বাতাস
- উত্তেজনা/দুঃচিন্তা
- যাদের ঠান্ডা বা সর্দি লেগেছে তাদের সংস্পর্শ

হাঁপানী বা এ্যাজমা কত ধরনের ?

উপসর্গ প্রকাশের উপর ভিত্তি করে হাঁপানী ৪ (চার) ধরনের-

১।হঠাৎ আক্রান্ত এ্যাজমা (Acute Asthma)ঃ শুরু হয় হঠাৎ করে। এই ধরনের হাঁপানীতে, এ্যালার্জি অর্থাৎ ঠান্ডা, ধূলা বা পশু-পাখির সংস্পর্শে আসলে উপসর্গ শুরু হয় এবং এই উপসর্গ কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। ঔষধ ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এ্যালার্জেনের কারণে, আবহওয়া পরিবর্তনের কারণে, পেশাগত কারণে বা ব্যায়ামের কারণে সাধারণতঃ এই ধরণের এ্যাজমাতে আক্রান্ত হয়। এই রোগী আবার সুস্থ হয় তাড়াতাড়ি।

২।স্থায়ী পুরাতন এ্যাজমা (Chronic Asthma)ঃ অনিয়মিতভাবে বা অপরিকল্পিতভাবে অপর্যাপ্ত ঔষধ খেলে এবং অনেক দিনে ধরে এ্যাজমাতে ভুগলে স্থায়ী পুরাতন এ্যাজমা সৃষ্টি হয়। এই ধরণের রোগীদের সবসময় কিছু না কিছু শ্বাসকষ্ট থাকে এবং সামান্য পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যায়। তাদের সবসময় বাঁশীর মত সাঁই সাঁই শব্দ থাকে এবং এই শব্দের সাথে তারা অভ্যস্ত হয়ে পড়ে।

৩। মারাত্নক জটিল এ্যাজমা (Complicated Asthma)ঃ যে কোন ধরনের এ্যাজমা নিয়ন্ত্রণে না থাকলে যে কোন সময় মারাত্মক জটিল আকার ধারণ করে। এই ধরণের হাঁপানীতে, এ্যালার্জি অর্থাৎ ঠান্ডা, ধূলা বা পশু-পাখীর সংস্পর্শে আসলে উপসর্গ শুরু হয় এবং এই উপসর্গ কয়েক মিনিট থেকে কয়েক ঘন্টা স্থায়ী হয়। ঔষধ ব্যবহারে রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে যায়। এই রোগীকে চিকিৎসা করাও খুব কঠিন, তাই সব রোগীকে সচেতন থাকতে হবে যেন মারাত্মক জটিল এ্যাজমাতে আক্রান্ত না হয়।

৪। শারীরিক পরিশ্রমের-এর কারণে এ্যাজমা (Asthma due to physical labour & Stress)ঃ কোন কোন রোগীর শুধুমাত্র শারীরিক পরিশ্রম করলেই হাঁপানী উপসর্গ দেখা যায়। তাই এটাকে আমরা আলাদা ভাবে বলি। সব হাঁপানী রোগীই কমবেশী ঔষধ ছাড়া শারীরিক পরিশ্রম করলে হাঁপানীতে আক্রান্ত হতে দেখা যায়।

উপশমঃ

প্রাথমিক ভাবে শ্বাসকষ্ট উপশমের জন্য বয়স ও মাত্রানুযায়ী সালবিউটামল বা এমাইনোফাইলিন ট্যাবলেট/সিরাপ দিতে হবে এবং প্রয়োজনে হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

প্রতিরোধ ঃ

- মুক্ত বাতাসে থাকার চেষ্টা করতে হবে।
- যে সব জিনিসের সংস্পর্শে আসলে হাঁপানী বেড়ে যায় তা থেকে দূরে থাকতে হবে।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চলতে হবে।
- ধুমপান বর্জন করতে হবে।

পাঠ-৪
পেপটিক আলসার

পেপটিক আলসার

পাকস্থলী (Stomach), ক্ষুদ্রান্ত (Small intestine) এর প্রথম অংশ অথবা খাদ্যনালী (Esophagus) এর নিম্নাংশে যে আলসার হয় তাকে পেপটিক আলসার বলে। সাধারণতঃ হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি (Helicobacter Pylori) নামক ব্যাকটেরিয়া এবং এন.এস.এ.আই.ডি (NSAID/ Non steroidal anti-inflammatory drugs) জাতীয় ঔষধ সেবনের কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। পুরুষদের মধ্যে এ রোগের প্রকোপ বেশী হয়ে থাকে। বিশ্বের শতকরা ৪ ভাগ লোক এ রোগে আক্রান্ত হয়। প্রতি লক্ষ রোগীর মধ্যে ১ জনের মৃত্যু হয়।

টাইপ ঃ পেপটিক আলসার সাধারণতঃ দু'ধরনের হয়ে থাকে।

ক) ডুয়োডেনাল আলসার (1st Part of duodenam)

খ) গ্যাসট্রিক আলসার (Stomach)

ঝুকিপূর্ণ উপাদান/অবস্থা (Risk Factor)ঃ

- হেলিকোব্যাকটার পাইলোরি জীবাণু
- নন ষ্টেরয়ডাল এন্টি ইনফ্লামেটরি ড্রাগস যেমন- এসপিরিন, ক্লোফেনাক ইত্যাদি।
- ষ্টেরয়েড থেরাপি
- ধুমপান
- অতিরিক্ত মদ্যাপান
- জেনেটিক ফ্যাক্টর
- জোলিংগার ইলিসন সিনড্রোম
- ব্লাড গ্রুপ
- হাইপার প্যারাথাইরয়েডিজম

লক্ষণ ও উপসর্গ ঃ

- **পেটের উপরের অংশে ব্যথা (ইপিগ্যাসট্রিক পেইন)**

ডুয়োডেনাল আলসার ঃ খালি পেটে ব্যথা হয়। খাওয়ার ১ - ৩ ঘন্টা পরে ব্যথা হয়ে থাকে এবং ব্যথার জন্য রোগী ঘুম থেকে জেগে উঠে। খাদ্য, এ্যান্টাসিড অথবা বমি করলে ব্যথার উপশম হয়।

গ্যাসটিক আলসার ঃ খাবার খেলে ব্যথা বেড়ে যায়। বমিতে ব্যথা কমে।

- বমি বমি ভাব (Nausea- Common in gastric ulcer)
- বমি হওয়া (Vomiting- Common in gastric ulcer)
- বুক জ্বালা (Burning upper abdomen)
- ঢেকুর উঠা/ ঢেকুর তোলা (Belching)
- পেট ফাপা (Dyspepsia)
- চর্বি জাতীয় খাবার হজম না হওয়া (Fat intolerance)
- ক্ষুধামন্দা (Poor appetite Anorexia)
- ওজন কমে যাওয়া (Weight loss - Common in gastric ulcer)
- ইপিগ্যাসট্রিক টেন্ডারনেস (Epigastric tenderness)
- রক্ত বমি (Haematemesis)
- কালো পায়খানা (Melaena)

জটিলতা ঃ

- রক্ত বমি (Haematemesis)
- আলকাতরার মত কালো পায়খানা (Melaena)
- পারফোরেশন (Perforation)
- পাইলোরিক ষ্টেনোসিস (Gastric outlet obstruction)
- ক্যানসার (Carcinoma in case of stomach ulcer)

চিকিৎসা

ওমিপ্রাজল ২০ মি: গ্রাম x দৈনিক ২ বার x ১ - ২ মাস

অথবা,

রেনিটিডিন ১৫০ মিঃ গ্রাম দৈনিক ২ বার ২ মাস

বর্জনীয় বিষয়সমূহ ঃ

- ধুমপান বর্জন
- মদ্যপান বর্জন
- ব্যথার (NSAID জাতীয় ঔষধ) ঔষধ বর্জন
- মানসিক চাপ কমানো (Stress reduction)

পাঠ-৫

আয়রন-এর অভাবজনিত রক্তস্বল্পতা

মানব দেহে প্রতি ১০০ মিঃ লিঃ রক্তে গড়ে ১৪.৮ গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে। ১০০ মিঃ লিঃ রক্তে ১১ গ্রাম হিমোগ্লোবিনের চেয়ে কম হলে রক্তস্বল্পতা (Anaemia)বলা হয়। হিমোগ্লোবিনের তৈরিতে আয়রণ নামক খনিজ লবন পুষ্টি উপাদানের প্রয়োজন হয়। এই রক্তস্বল্পতা যখন দেহে আয়রণের অভাব হয়ে থাকে তখন তাকে আয়রণ অভাব জনিত (অপুষ্টি জনিত) রক্তস্বল্পতা বলা হয়। রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ সকলের সমান নয়।

স্বাভাবিক পুরুষদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১৪-১৬ গ্রাম/ ১০০ মিঃ লিঃ

স্বাভাবিক মহিলাদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১২-১৪ গ্রাম/১০০ মিঃ লিঃ

নবজাতকের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১৯ গ্রাম/১০০মিঃ লিঃ

শিশুদের হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ১১.৫ গ্রাম/১০০মিঃ লিঃ

হিমোগ্লোবিনের মাত্রা অনুযায়ী রক্তস্বল্পতাকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়-

স্বল্পমাত্রার রক্তস্বল্পতা (Mild Anaemia): ৮-১০.৯ গ্রাম/১০০ মিঃলিঃ

মধ্যম মাত্রার রক্তস্বল্পতা (Moderate Anaemia): ৬-৭.৯ গ্রাম/১০০মিঃ লিঃ

মারাত্মক রক্তস্বল্পতা (Severe Anaemia): ৬ গ্রাম/১০০ মিঃ লিঃ -এর নীচে

রক্তস্বল্পতার লক্ষণ ও চিহ্ন

- ❖ হিমোগ্লোবিনের কারণেই রক্তের রং লাল দেখায়। রক্তস্বল্পতায় হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ কমে যাওয়ার ফলে শরীরে বিভিন্ন স্থানের ঝিল্লি/আবরণ ফ্যাকাশে দেখায়।
- ❖ চোখের পাতার ভিতরের দিক (Conjunctiva) ফ্যাকাশে দেখাবে।
- ❖ ঠোঁট ও জিহ্বার ঝিল্লি ফ্যাকাশে দেখাবে।
- ❖ হাতের তালু ও নখ ফ্যাকাশে দেখাবে।
- ❖ এছাড়া একনজরে রোগীর চেহারা ফ্যাকাশে দেখাবে।
- ❖ রোগী দূর্বলতা, মাথা ঘোরা, অল্প পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠার অভিযোগ করতে পারে।
- ❖ রক্তের ঘনত্ব কমে যাওয়ার ফলে পায়ে এবং শরীরে পানি আসতে পারে।
- ❖ রক্তের অক্সিজেন পরিবহন ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে শ্বাস প্রশ্বাস এবং নাড়ীর গতি স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী হবে।
- ❖ মারাত্মক রক্তস্বল্পতার কারণে Heart Failure দেখা দিতে পারে।

রক্তস্বল্পতার কারণ সমূহ ঃ

- খাদ্যে আয়রণ, আমিষ এবং ভিটামিন এর অভাব।

- বক্রকৃমির কারণে অন্ত্র থেকে রক্তক্ষরণ।
- মাসিকের সময় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।
- ক্ষতস্থান থেকে দ্রুত অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।
- ম্যালেরিয়ার কারণে লোহিত কণিকা ধ্বংস হয়ে যাওয়া।
- অস্থিমজ্জার অসুখের কারণে রক্তকণিকা কম উৎপন্ন হওয়া।
- ঘন ঘন বাচ্চা হওয়া।
- প্রসব পূর্ব এবং প্রসব পরবর্তী অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ।

রক্তস্বল্পতা দুই ভাবে নির্ণয় করা যায়

- শরীরের বিভিন্ন স্থানে মিউকাস মেমব্রেন (ঝিল্লী/আবরণ) পরীক্ষা করে।
- রক্তের হিমোগ্লোবিন পরিমাপ করে

আমাদের শরীরের যে সব জায়গায় মিউকাস মেমব্রেন খুবই পাতলা সেখান দিয়ে ভিতরের প্রবাহমান রক্তের রং দেখা যায়। রক্তস্বল্পতা হলে এইসব মিউকাস মেমব্রেন ফ্যাকাশে দেখায়। সাধারণতঃ নিম্নলিখিত স্থানসমূহের মিউকাস মেমব্রেন পরীক্ষা করা হয়ঃ

- চোখের নীচের পাতার ভেতরে
- জিহ্বা এবং ঠোঁট
- আংগুলের ডগা এবং নখ
- হাতের তালুতে।

চোখের নীচের পাতার মিউকাস মেমব্রেন পরীক্ষা করার জন্যঃ

মিউকাস মেমব্রেন পরীক্ষার আগে কি করতে যাচ্ছেন রোগীকে ব্যাখ্যা করুন -

- রোগীর মুখোমুখি বসুন।
- দুই হাতের বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে চোখের নীচের পাতা নীচের দিকে টেনে ধরুন।
- এখন রোগীকে উপরের দিকে তাকাতে বললেই চোখের মিউকাস মেমব্রেন স্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

এভাবে বেশ কয়েক জনের চোখের পাতা পরীক্ষা করলেই মোটামুটি ধারণা হয়ে যাবে রক্তস্বল্পতায় মিউকাস মেমব্রেন কেমন দেখায়।

জিহ্বায় রক্তস্বল্পতা দেখার জন্য রোগীকে জিহ্বা বের করতে বলতে হবে এবং জিহ্বা নিরীক্ষণ করতে হবে।

আঙ্গুলের ডগা ও নখের রক্তস্বল্পতা দেখার জন আঙ্গুলের ডগার অগ্রভাগে চাপ দিয়ে এবং আঙ্গুল উল্টিয়ে নখে চাপ দিয়ে রক্তস্বল্পতা দেখুন।

রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমান জানার জন্য রক্ত পরীক্ষাঃ

- রক্ত পরীক্ষার সব উপকরণ প্রস্তুত করে নিন। যেমন– একটি বড় ট্রেতে স্পিরিট, তুলা, ল্যানসেট সূচ, স্কালা-কাগজ।
- রোগীর কাছে ব্যাখ্যা করুন তার রক্তস্বল্পতা আছে কিনা তা জানা অত্যন্ত প্রয়োজন।
- আপনার হাত সাবান দিয়ে ভালো ভাবে ধুয়ে নিন।
- রোগীর বাম হাতের অনামিকা আংগুলের মাথার দিকটা তুলায় স্পিরিট লাগিয়ে পরিস্কার করে নিন।
- আঙ্গুলের যে জায়গা থেকে রক্ত নিবেন তার ঠিক নীচেই দুই আঙ্গুল দিয়ে চেপে ধরুন।
- জীবাণুমুক্ত উপায়ে ল্যানসেটের মাথার কাগজ সরিয়ে নিন এবং আঙ্গুলের মাথার চামড়া হঠাৎ করে ফুঁড়ে নিন। ল্যানসেটটি কিডনী ট্রেতে রাখুন। একটি ল্যানসেট একবারের বেশী ব্যবহার করবেন না।
- রক্তের প্রথম ফোঁটাটি তুলা দিয়ে মুছে ফেলুন।
- তারপর রক্তের একটি ফোঁটা স্কালা কাগজে শুষে নিন।
- একটুকরা তুলায় স্পিরিট লাগিয়ে আংগুলের ফোঁড়া জায়গাটি চেপে ধরতে বলুন যতক্ষণ রক্তঝরা বন্ধ না হয়।
- শুকিয়ে গেলে কাগজের রক্তের রং স্কালা বইয়ের শতকরা হিসাবের রংয়ের সাথে মিলিয়ে রক্তে হিমোগ্লোবিন এর পরিমাণ দেখে নিন।

ফলাফল ঃ

ক) স্বাভাবিক- ৮০% এর উপরে।

খ) স্বল্পমাত্রার রক্তস্বল্পতা - ৮০% এর কম হলে।

গ) মধ্যম মাত্রার রক্তস্বল্পতা - ৬০% এর কম হলে।

ঘ) মারাত্মক রক্তস্বল্পতা - ৪৫% এর কম হলে।

- আপনার হাত ভালভাবে ধুয়ে নিন।
- ফলাফল লিপিবন্ধ করুন।
- ফলাফলের ভিত্তিতে যথাযথ পদক্ষেপ নিন। (৫০% এর উপরে এবং ৮০% এর নীচে হলে চিকিৎসা দিন, ৫০% এর নীচে হলে রেফার করুন)।
- কাজ শেষে জিনিস পত্র যথাস্থানে গুছিয়ে রাখুন।
- ৮ সপ্তাহ টেবলেট খাবার পর আবার রক্ত পরীক্ষা করুন। যদি কোন উন্নতি না হয় ডাক্তারের কাছে রেফার করুন।

বিঃ দ্রঃ এই পদ্ধতিতে শুধু হিমোগ্লোবিনের শতকরা হার জানা সম্ভব। সঠিক পদ্ধতি জানার জন্য Hemoglobin estimation পদ্ধতি ব্যবহার করে হিমোগ্লোবিন পরিমাপ করে নিতে হবে।

ফলিক এসিড/আয়রন বড়ি খাইয়ে স্বল্প ও মধ্যম মাত্রার রক্তস্বল্পতা চিকিৎসা করতে হবে।

ব্যবহার ঃ গর্ভবতী, প্রসূতি মা এবং রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন এধরনের মহিলা এবং কিশোরীদের বিশেষ করে আয়রন ঘাটতি জনিত রক্তস্বল্পতার জন্য এই বড়ি খুবই উপকারী।

আয়রণ টেবলেটের সেবন মাত্রা

বয়স	০-১ বৎসর	১-৫ বৎসর	৬-১২ বৎসর	পূর্ণ বয়স্ক
টেবলেট	১টি করে দিনে ২ বার	১টি করে দিনে ৩ বার	১টি করে দিনে ২ বার	১টি করে দিনে ৩ বার

কতদিন খাওয়াতে হবে ঃ প্রয়োজন অনুসারে অর্থাৎ রক্তস্বল্পতা সেরে না উঠা পর্যন্ত (সাধারণতঃ ১-৩ মাস)

বিঃ দ্রঃ গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসার সময় কাল গর্ভকালীন সময় এবং প্রসবের পর ৩ মাস পর্যন্ত চিকিৎসা চালাতে হবে।

- উত্তমরূপে শোষনের জন্য ঔষধ খালিপেটে, খাবারের ১ ঘন্টা আগে বা দুই ঘন্টা পরে খেতে হবে।
- আয়রন বড়ি খেলে পেটের গন্ডগোল, সাথে বুক জ্বালা, বমি বমি ভাব, পেট ফাঁপা, কোষ্ঠকাঠিন্য বা পাতলা পায়খানা হতে পারে।
- অশোষিত আয়রনের কারণে পায়খানার রং কালো হতে পারে। এতে কোন ক্ষতি হয় না।
- আয়রন জাতীয় খাবার যেমন-সবুজ শাকসব্জি, কচুশাক, সীমের বীচি, ডাল ও অন্যান্য বীচি জাতীয় খাবার, আটার রুটি, কলিজা এবং সব ধরনের স্বাভাবিক খাবার খেতে বলতে হবে।
- শাকসব্জি ধুয়ে তারপর কেটে রান্না করতে হবে যাতে আয়রন নষ্ট না হয়।
- নির্দিষ্ট সময় শারীরিক পরীক্ষার জন্য ক্লিনিকে বা স্বাস্থ্য কর্মীর কাছে আসতে বলতে হবে।

চিকিৎসকের কাছে রেফার

- মারাত্মক রক্তস্বল্পতায় রেফার করতে হবে।
- যদি হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৪৫% অথবা ৬ গ্রাম/১০০ মিঃ লিঃ এরকম হয় তাহলে রোগীকে রক্ত দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে রোগীকে হাসপাতালে রেফার করুন।
- যদি রোগীর শ্বাস কষ্ট হয় বা নাড়ীর গতি ১০০ মিনিট এর উপরে হয় তাহলে অবিলম্বে রেফার করুন।
- আয়রণ বড়ি দেবার ২ মাসের মধ্যে কোন উন্নতি না হলে ডাক্তারের কাছে রেফার করুন।

পাঠ-৬
আর্সেনিকোসিস

আর্সেনিকোসিস

পানি বা অন্য কোন মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য মাত্রার অধিক পরিমাণে আর্সেনিক দীর্ঘকাল (কমপক্ষে ৬ মাস) যাবৎ মানবদেহে প্রবেশ করলে চামড়ায় বিশেষ ধরনের লক্ষণ দেখা যায় তাকে আর্সেনিকোসিস বলে। এতে শরীরের ভিতরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আক্রান্ত হতে পারে, এমনকি ক্যান্সার ও হতে পারে।

আর্সেনিকোসিসের উপসর্গ ও লক্ষণসমূহ

লক্ষণসমূহ ঃ

চামড়ার পরিলক্ষিত লক্ষণসমূহ ঃ

১। মেলানোসিস ও লিউকোমেলানোসিস

২। কেরাটোসিস

উপসর্গঃ দূর্বলতা, অবশভাব, দীর্ঘস্থায়ী কাশি, চোখ লাল হয়ে যাওয়া ইত্যাদি।

মেলানোসিস ঃ

দীর্ঘদিন যাবৎ (গ্রহনযোগ্য মাত্রার অধিক) আর্সেনিক গ্রহণের ফলে যদি কারো শরীরের বিভিন্ন অংশে বিশেষতঃ বুকে বা পিঠে অসংখ্য ছিট ছিট কালচে বাদামী বা তিলের ন্যায় কালো কালো দাগ দেখা দেয় তবে তাকে মেলানোসিস বলে। সাধারণতঃ শরীরের ঢাকা অংশে মেলানোসিস দেখা দেয়।

লিউকোমেলানোসিস

শরীরে মেলানোসিস আক্রান্ত স্থানে যদি কালচে দাগের মধ্যে সাদা অথবা ঘোলাসাদা দাগ দেখা যায় তবে তাকে লিউকোমেলানোসিস বলে। যা মেলানোসিসের সাথে পাওয়া যায়।

কেরাটোসিস

যদি কারো উভয় হাতের তালু ও উভয় পায়ের তলদেশে একই সাথে অসংখ্য মিহি দানা বা চামড়া শক্ত ও খসখসে হয়ে যায় যা কেবল অনুভব করা যায় তাকে আর্সেনিকজনিত কেরাটোসিস বলে।

আর্সেনিকোসিস রোগী সনাক্তকরণ

যদি কারো শরীরে শুধু মেলানোসিস কিংবা কেরাটোসিস বা উভয় লক্ষণ পরিলক্ষিত হয় এবং দীর্ঘদিন যাবৎ তার খাবার পানিতে আর্সেনিকের দূষণের ইতিহাস পাওয়া যায় তবে তাকে আর্সেনিকোসিস রোগী হিসাবে সনাক্ত করা যায়।

আর্সেনিকোসিস রোগের জটিলতাঃ

১. গ্যাংগ্রিন বা পচন
২. দীর্ঘস্থায়ী ক্ষত
৩. লিভার, মূত্রাশয় (ব্লাডার), ফুসফুস ও কিডনী আক্রান্ত হতে পারে
৪. বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সার
৫. দীর্ঘস্থায়ী কাশি

আর্সেনিকোসিস রোগীর চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপনা

আর্সেনিকোসিস থেকে সম্পূর্ণ নিরাময়ের কোন চিকিৎসা পদ্ধতি এখনো আবিস্কৃত হয়নি। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় এবং আর্সেনিক দূষিত পানি (আর্সেনিকযুক্ত নলকুপের পানি) পান বন্ধ করলে রোগীর উন্নতি অনেকাংশে সম্ভব হয়। সেই সাথে ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্য, তাজা ফলমুল গ্রহণ করলে রোগ নিরাময় সহজ ও দ্রুত হয়। সফল চিকিৎসার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে রোগ নির্ণয় অত্যাবশ্যক।

আর্সেনিকোসিসের কোন সুনির্দিষ্ট চিকিৎসা ব্যবস্থা না থাকায় রোগ প্রশমনের নিমিত্তে আমাদের দেশে বর্তমানে নিম্নলিখিত চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু আছে।

১। আর্সেনিক দূষিত নলকুপের পানি পান বন্ধ করা এবং রান্নার কাজে ব্যবহার না করা।

২। ভিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ পুষ্টিকর খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ। ভিটামিন এ,ই,সি এবং ফলেট আর্সেনিক বিষক্রিয়া উপসম ত্বরান্বিত করে। এই ভিটামিনগুলি আর্সেনিকোসিস রোগীকে (প্রাপ্ত বয়স্ক) নিম্নলিখিত মাত্রায় দেয়া হয়। ভিটামিন এ প্রতিদিন ৫০০০০ আই,ইউ; ভিটামিন-ই প্রতিদিন ২০০ মিলিগ্রাম; ভিটামিন-সি প্রতিদিন ৫০০ মিলিগ্রাম। এই ঔষধ একটানা ৩ (তিন) মাস খাবার পর ২ (দুই) মাসের জন্য বন্ধ রাখতে হবে, কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া না হলে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজন হলে আবার ৩ (তিন) মাসের জন্য এটা ব্যবহার করা যেতে পারে। স্বল্প আক্রান্ত রোগীদের একদিন অন্তর অন্তর উপরোক্ত মাত্রায় ভিটামিন গুলি দেয়া যেতে পারে। শিশুদের ক্ষেত্রে ভিটামিনগুলি বয়স ও ওজন অনুযায়ী নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয়। আর্সেনিকোসিস রোগীর চিকিৎসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয়। গর্ভবতী মায়েদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহার করা যাবে না।

৩। বেশী পরিমাণে আমিষ, জাতীয় খাদ্য গ্রহণ করলে বিশেষতঃ গ্রামাঞ্চলে উদ্ভিদ জাতীয় খাদ্য যেমনঃ সীমের বীচি, কাঁঠালের বীচি, মটরশুটি, বরবটি, ডাল ইত্যাদির তাছাড়া বিভিন্ন রকমের শাক-শব্জি যেমন: পুঁইশাক, সজনেশাক ইত্যাদি বেশী করে খেলে এ রোগের লক্ষণ ধীরে ধীরে কমে এসে নিরাময় হতে থাকে।

৪। কেরাটোসিস অর্থাৎ হাত ও পায়ের তালুর শক্ত ও গোটা হয়ে যাওয়ার চিকিৎসা হিসেবে হালকা গরম পানিতে হাত/পা কিছুক্ষণ রেখে ঘসলে শক্ত গোটা মসৃণ হয়, এর সাথে হাত ও পায়ের তালুতে ৫-১০% ইউরিয়া স্যালিসাইলিক এসিড সম্বলিত মলম প্রয়োগ করলে আরো উপকার পাওয়া যায়। কিন্তু স্বাভাবিক চামড়ায় এ মলম লাগানো উচিৎ নয়।

বিকল্প পানি সরবরাহ

বিকল্প পানীয় পানির জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ উল্লেখ করা যায়।

১। কূয়ার পানি নিরাপদ করে।

২। ভূ-উপরিভাগের পানি বিশুদ্ধ করে (ফুটিয়ে)

৩। বৃষ্টির পানি সংগ্রহ করে।

৪। পন্ড স্যান্ড ফিল্টারের (পিএসএফ) মাধ্যমে পরিশোধিত পানি।

৫। পরিশোধিত পানি পাইপের মাধ্যমে সরবরাহ।

৬। গভীর নলকুপের পানি।

পাঠ-৭

স্তন ক্যান্সার (Breast Cancer)

স্তনের কোষে যে ক্যান্সারের সৃষ্টি হয় তাই হলো স্তন ক্যান্সার। পুরুষদের চেয়ে মহিলারাই এ ক্যান্সারে বেশি আক্রান্ত হয়। বাংলাদেশে প্রতি বছর বিরাট সংখ্যাক মহিলা এ ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছে।

স্তন ক্যান্সারের লক্ষণ ও উপসর্গ:

স্তন ক্যান্সারে আক্রান্তদের যে সমস্ত উপসর্গ দেখা যায় তা হলো-

- স্তনে হাত দিলে গরম অনুভূত হবে।
- স্তনের বোটা অধোমুখ হওয়া যা আগে ছিল না।
- স্তনের উপর চামড়ার কমলা রংয়ের মত পরিবর্তন, টোল পড়া।
- স্তনের বোটা দিয়ে রক্ত মেশানো তরল পদার্থ বের হওয়া।
- হঠাৎ করে স্তনের আকৃতির পরিবর্তন যা মাসিক চক্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন।
- স্তনের বোটায় ব্যথা ও খসখসে ভাব।
- সার্বক্ষণিক স্তনের ব্যথা যা মাসিক চক্রের সঙ্গে সম্পর্কহীন।
- বাহির পাশে বা বগলে লসিকাগ্রন্থি ফুলে যাওয়া।
- চামড়ার নীচে চাকা বা শক্ত হয়ে যাওয়া।

উপরে উল্লেখিত উপসর্গ দেখা দেয়া মাত্র রোগীকে হাসপাতালে যেতে এবং বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে উপদেশ দিতে হবে।

স্তন ক্যান্সারের কারণ:

কি কারণে স্তনের ক্যান্সার হয় তা এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। তবে বেশ কিছু বিষয় আছে যেগুলিকে কারণ বা ঝুঁকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। সেগুলি হলো-

- মহিলাদের ক্ষেত্রে ঝুঁকির পরিমাণ বেশী।
- বয়স যত বেশী হবে ক্যান্সারের ঝুঁকি তত বেশী।
- স্তন ক্যান্সারের পূর্ব ইতিহাস।
- স্তন ক্যান্সারের পারিবারিক ইতিহাস।
- খুব কম বয়সে মাসিক শুরু (Menerche) হলে।
- খুব বেশি বয়সে মাসিক বন্ধ (Menopause)হলে।
- বেশী বয়সে প্রথম সন্তানেরজন্ম হলে।
- মদ্যপান করলে।
- Menopause এর পরে হরমোন দিয়ে চিকিৎসা করলে।
- তেজস্ক্রীয়তার সংস্পর্শে থাকলে।

পাঠ-৮
জরায়ু মুখে ক্যান্সার (Cervical Cancer)

জরায়ুর মুখে পৃষ্ঠভাগে কোষের বিভিন্ন ধররে অস্বাভাবিক কর্মকান্ড শুরুর মাধ্যমেই জরায়ুর ক্যান্সারের সূচনা হয়। এই অস্বাভাবিক কোষ কর্মকান্ড হলো সত্যিকার ক্যান্সার শুরুর পূর্বাবস্থা অর্থাৎ প্রি-ক্যান্সার। যদি সময়মত সনাক্তকরণ এবং চিকিৎসা না দেয়া হয় তাহলে এটি পুরোপুরি ক্যান্সারে রূপ নেয়। এই ক্যান্সারের জন্য হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) কে দায়ী করা হয়। সাধারণতঃ যৌন কাজের মাধ্যমে অন্যের শরীর থেকে এই ভাইরাস শরীরে ঢোকে। এই ক্যান্সারে আক্রান্তের ঝুঁকিতে যারা থাকে তারা হলোঃ-

- খুব কম বয়সে যৌন কাজ শুরু করা হলে
- যাদের একের অধিক যৌন সঙ্গী আছে
- বিভিন্ন যৌন রোগে যারা ভুগছে
- ধুমপায়ী
- যাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম

রোগ সনাক্তকরণ:

প্রাথমিক অবস্থাতেই PAP Test এর মাধ্যমে এ রোগ সনাক্ত করা যায় এবং যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া যায়, জরায়ুর মুখের ক্যান্সারে যে সমস্ত উপসর্গ দেখা দেয় তাহলোঃ-

- যুক্তিসঙ্গত কারণ (যেমন মাসিক) ছাড়াই যোনীপথ থেকে রক্ত বের হওয়া।
- সঙ্গমের সময় অথবা অন্য কোন সামান্য আঘাতেই যোনীপথ থেকে রক্ত বের হওয়া।
- সঙ্গমের সময় ব্যথা অনুভুত হওয়া।
- যোনীপথ থেকে রক্ত মিশ্রিত তরল পদার্থ বের হওয়া।

জরায়ুর ক্যান্সারের চিকিৎসা নির্ভর করে এটি কোন অবস্থায় আছে তার উপর। সে অনুযায়ী চিকিৎসকরা জরায়ু কেটে বাদ দেয়া, কেমোথেরাপী, রেডিওথেরাপী ইত্যাদির উপদেশ দিয়ে থাকেন।

প্রতিরোধঃ

- ভায়া বা VIA (Visual Inspection of Cervix with Acetic Acid) এর মাধ্যমে জরায়ুর মুখের ক্যান্সার সনাক্ত করা যায়।
- টিকা দিয়ে জরায়ু ক্যান্সার প্রতিরোধ করা যায়।
- ৯ -১৪ বৎসরের শিশুদের ২ ডোজ Cervarix টিকা দিয়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা যায়। (০,৬)
- ১৪ বৎসরের উর্দ্ধে বয়সের মহিলাদের জন্য ৩ ডোজ টিকা দিতে হবে। (০,২,৬)

নিয়মিতভাবে PAP Test এর মাধ্যমে এই ক্যান্সারের আগাম সতর্কতা পাওয়া যায় এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নিলে একে প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও কম বয়সে যৌন কাজ শুরু না করলে, একের অধিক যৌনসঙ্গী না থাকলে এবং ধুমপান না করলে এর ঝুঁকি থেকে দুরে থাকা যায়।